দ্বীপ—দ্বীপান্তর

মনোজ রায়

রীডার্স অ্যাসোসিয়েট্‌স
১৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ
১৩৭০

প্রকাশক
পূরেন্দ্রনাথ রায়

রীডার্স অ্যাসোসিয়েট্‌স
৭৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক
রামপ্রসাদ রাণা
নিও প্রিণ্টার্স
৭৬, বৌবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

পরিবেশক
গ্রন্থলোক
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা

॥ জন্ম-কাহিনী ॥

এক

যতদূর সম্ভব আলোয়ানে নিশ্ছিদ্র হয়ে গতি দ্রুততর করলো অসিত।

শীত, সংগে মনের শংকা মিশে দেহটাকে কাঁপিয়ে তুলছে বারবার। সাড়ে এগারোটা বাজতেই রাস্তা ফাঁকা। দোকান পাট বন্ধ। চওড়া রাস্তাটা কেমন বে-আব্রু। শুধু কুয়াশার পাতলা চাদর ঢাকা ব'লে যেন অশ্লীল নয়। আলোগুলো স্তিমিত—দূরের গুলো লাল। শীতে কি তামার তারে বিদ্যুৎ জমে যায়, অসিত ভাবে: যেমন আতংকে ধমনীতে রক্ত ঘন হয়ে আসে?

আশ্চর্য! এত নার্ভাস নার্ভাস লাগছে কেন? আত্ম বিশ্লেষণে শক্তি খোঁজে অসিত—নার্ভাস হবার কারণ কি? অনভিজ্ঞ অনেক অভূতপূর্ব ঘটনায় স্থির থেকে কেমন একটা ধারণা হয়ে গিয়েছিল, হয়তো ভয় পাবার, নার্ভাস হবার অনুভূতিটাই নেই অসিতের। সেই ধারণাই বোধ হয় ভাঙার মুখে দেহটাকে এমন নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। নইলে কী আর শীত!

ডানদিকের সাইন বোর্ডে নজর রেখে চলতে হয়। জোড় সংখ্যার ঠিকানা এ দিকেই হবে। উদ্দিষ্ট ঠিকানার কাছে আসতে এখনো দেরী। বিরক্ত লাগে। রাস্তার নগ্ন নির্জনতায় নিজের পায়ের শব্দে নিজেকে অপরাধী মনে হয়। নিঃশব্দ গতি একটা পুলিশ ভ্যান চলে গেল পথ দিয়ে। অনেক রাত্রে রাস্তায় নাকি পুলিশে ধরে। ওরা তো কিছু জিজ্ঞাসা করলো না। তবে বোধ হয় পুলিশে ধরার মত রাত হয়নি এখনো। অসিত জোর পায় কিছুটা।

কোলপসিবল গেট বন্ধ-গ্যারেজ। তারপর দরজা বাড়ী ঢোকার।

ও পাশে ডাক্তারখানা। থমকে দাঁড়ায় অসিত। বাড়ীর দরজা ধাক্কাবে না ডিসপেনসারীর ? সেখানে জানালার ফাঁকে এখনো আলোর আভাস। অতএব ও দিক থেকেই সুরু করলো অসিত। চুপিচুপি কড়া নাড়লো।

ভেতরে ভারী গলার কথা বন্ধ হয় নি। শুনতে পায়নি নিশ্চয়ই। ভয়ে ভয়ে অত আস্তে নাড়লে কেউ শোনে ? আবার নাড়লো। এবার জোরে।

—কে ?

চেয়ার টানার শব্দ। কিছুক্ষণ। বিরাট ভাঁজ করা দরজার একটা পাল্লা খুলতেই এক ঝলক শান্ত পারদ আলোয় অসিত স্পষ্ট হল। আর অসিতের বুকের স্পন্দন।

—ভেতরে আসুন।

কী গম্ভীর আর মোটা গলার স্বর। ভদ্রলোক ছ' ফুটের বেশীই হবেন। কানের দু পাশে চুল কাঁচায় পাকায় ধূসর। মোটা ফ্রেমের চশমা, পুরু লেনস। ঠোঁট চাপা, চিবুক দৃঢ়। সবকিছু মিলিয়ে চেহারা বড় বেশী স্পষ্ট, অসিতের মনে হ'ল ঃ তবু কেমন যেন বিষণ্ণ।

—ডঃ এস, পি, চক্রবর্তী ?

ভদ্রলোক টেবিলের ও পাশে যেতে যেতে বললেন, আমি। বসুন।

বসতে গিয়ে নজর পড়লো আরেক জনের প্রতি। মহিলা। বয়স বোঝা দুঃসাধ্য। কোলের ওপর খোলা একটা মেডিক্যাল জার্নালে দৃষ্টি নত। ভ্রূ কুঞ্চিত। শীতবস্ত্রে মোড়া থাকলেও চেহারা তীক্ষ্ণ মনে হল ! সিঁথি সাদা।

—প্রয়োজন ?

মুখের ওপর ডাক্তার চক্রবর্তীর স্থিরদৃষ্টি অনুভব ক'রে অসিত সামনের আলমারীর দিকে দৃষ্টি ছড়ালো। ওষুধ পত্রের শিশি, নাম পড়ার চেষ্টা করলো না, শুধু তাকিয়ে রইল।

—যদি খুব অসুবিধা না হয়, তবে একবার, একটু থেমে অসিত কথা শেষ করলো, আমাদের বাড়ী আসতে হবে।

—এখন ? এই রাত্রে ?

অসিত নিরুত্তর। চোখে যতদূর সম্ভব অনুনয় ফুটিয়ে নির্বোধের মত তাকালো।

—এখনও খাওয়া হয়নি আমার। কাল সকালে আসতে পারেন না?

স্বাভাবিক হবার চেষ্টায় অসিত একটু হাসলো। ফলে আরও অসহায় দেখাল তাকে, ততক্ষণ পেশেণ্ট কি—?

—কি কেস?

—ডেলিভারি।

—তা আমাকে কি দরকার? আমি কি মিডওয়াইফ? ডাক্তার চক্রবর্তী অকারণেই একটা কলম নাড়াচাড়া করলেন, হসপিটালে দিয়ে দিন। ভয়ের কি আছে?

ডাক্তারের স্বরে আপত্তি ছাপিয়ে বিরক্তি এবার স্পষ্ট। কি ভাবে বললে মন যথেষ্ট গলানো যায় ভাবতে ভাবতে অসিত মেয়েটির দিকে তাকালো। সেও তাকিয়েই ছিল, দৃষ্টি সরালো না। কোঁচকানো ভ্রূ এখন টানটান, সেখানে শুধু কৌতূহল।

অসিতের বিশ্রী লাগে। মেয়েটাকে বেহায়া ভাবতে ভাল লাগলো।

—হাসপাতালের কথা যে ভাবিনি তা নয়। কিন্তু নেওয়াই যে অসুবিধা।

—কেন?

অসিত উত্তর দিতে একটু সময় নিলো, ঘটনাটা মনে মনে গুছিয়ে নিয়ে বললো, এখন সবে আটমাস। আজ সন্ধ্যায় রান্নার জল তুলতে গিয়ে ভারী বালতি সমেত ও দাওয়া থেকে পড়ে যায়। আগেই দুর্বল ছিল এখন দারুণ হেমারেজ হচ্ছে। মাঝে মাঝে জ্ঞানও থাকছে না। এর মধ্যে কি হাসপাতালে নেবার ঝক্কি সইতে পারবে?

—পেশেণ্ট আপনার কে হন?

ডাক্তারের পক্ষে অতি সাধারণ সংগত প্রশ্ন। তবু অসিত যেন চমকে উঠলো। মেয়েটা লক্ষ্য করছে কিনা কে জানে।

—আমার স্ত্রী। একটু জোরেই বললো অসিত।

—কোথায় থাকেন?

—ভবানীপুর।

—অতদূর থেকে এখানে? ওদিকেই তো—

এতক্ষণে চোখে পড়লো যা' সব আগে পড়া উচিত ছিল। পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করলো অসিত।

—নারায়ণ বাবু, মানে নারায়ণ সামন্ত আপনার কথা বললেন। আর এই চিঠিটাও—

ডাক্তার চিঠিটা নিলেন, ড্রয়ারে রাখলেন, পড়লেন না। শুধু ঠোঁট-দুটো গোল করে শিস্ দেবার ভংগীতে অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন।

—তা' যান না একবার। দেখে আসুন গে'।

অসিতের উপস্থিতিতে মেয়েটির এই প্রথম কথা। গলার স্বর মৃদু, কিন্তু তীক্ষ্ণ। আর একটু চটুল। ঠোঁটের বাঁকে হাসিটা এবার স্পষ্ট। অসিতের মনে হয়, তাকে করুণা দেখাবার জন্যেই এই অনুরোধ। ডাক্তার নড়ে চড়ে বসলেন।

—আমাকে তো পৌঁছুতে যাবেনই, ফেরার পথে দেখে আসবেন না হয়।

কোন ঘড়িতে যেন বারোটা বাজলো।

—বেশ, চলুন। ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন,—সীতা তুমি ব্যাগটা গুছিয়ে ফেল', আমি গাড়ি বার করছি।

ডাক্তার চক্রবর্তী বাইরে গেলেন। সীতা কালো ব্যাগ নিয়ে আলমারীর সামনে দাঁড়ালো। কি সব যন্ত্র-পাতি ব্যাগে ভরতে ভরতে হঠাৎ প্রশ্ন করলো পেছন ঘুরেই, আপনার নাম অসিত চৌধুরী না?

ভয়ানক চমকে উঠলো অসিত। ঘরে অন্য কেউ নেই, অতএব তাকেই উত্তর দিতে হবে বুঝে ঢোঁক গিললো আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু আপনাকে তো—

—চিনতে পারছেন না। মেয়েটি বোধহয় হাসলো।

ডাক্তার ফিরে এলেন। দেয়ালে গাথা র‍্যাক থেকে কোট তুলে বললেন, চলুন। এসো সীতা।

শীত, আশংকা আর কৌতূহলে অসিতের অন্তরাত্মা পর্যন্ত যেন হি হি করে উঠলো বাইরে। সীতা সামনে ডাক্তারের পাশের সীটে বসলো। অসিত পেছনে। চওড়া গদীতে বসে চোখ বুঁজে আসতে চায় ক্লান্তিতে। রাস্তার কুয়াসা মেশা ম্লান আলো নিয়মিত বিরতিতে সীতার বাঁ পাশ আলোকিত ক'রে সরে যাচ্ছে। অসিতের রাগ হয়। মেয়েটি কে? ডাক্তার ওর কথাতেই রাজী হলেন। অসিত তবু কৃতজ্ঞতা অনুভব করতে পারেনা। ঋজু বসবার ভংগীতেও, অসিতের মনে হ'ল, যেন উদ্ধত বিদ্রূপের হাসিটা মাখানো। আকাশ পাতাল ভেবেও সীতার সংগে পূর্ব পরিচয়ের সামান্য

ইতিহাসও আবিষ্কার করতে না পেরে বিরক্তিতে অসিত চোখ বুঁজলো।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, ডাক্তারের ডাকে সোজা হয়ে বসলো অসিত। সীতা কোথায় যেন নেমে গেছে।

—ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নাকি? এবার কোনদিকে যাবো, বলুন?

—এটা কোন জায়গা?

—জগুবাবুর বাজার।

চারদিকে তাকিয়ে অসিত রাস্তার নিশানা বললো। বাড়ীর রাস্তায় ঢুকতেই বুকের কাঁপুনি আবার তীব্র হল।

—সামনের গ্যাস পোষ্টের সামনে থামাবেন।

অসিত আগে নামলো। আলোয়ান ভাল ক'রে জড়িয়ে নিল। ভারী ব্যাগটা ডাক্তারের হাত থেকে নিয়ে বললো, আসুন। এই যে, এই দরজায়।

নারায়ণ সামন্ত অসিতের বাড়ীওলা হলেও লোক ভাল। অসিতের দেরী দেখে উৎকণ্ঠ প্রতীক্ষায় দোর গোড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন।

—এই যে বাবাজী এত দেরী যে?

—কেন এদিককার কি খবর?

—একই রকম। ডাক্তার এসেছে?

বাড়ীতে ঢোকার পথটা সরু আর অন্ধকার। ডাক্তার হাতড়ে হাতড়ে এসে ঢুকলেন। অসিতের উত্তর দেবার প্রয়োজন হল না।

—এই যে ডাক্তার, এসো এসো।

—এইটে তোমার বাড়ী?

—হ্যাঁ—এ ঘরে এসো।

ঘরটা আয়তনে ক্ষুদ্র, প্রয়োজনে বৃহৎ। না আছে হেন বস্তু নেই—কোণায় দড়িতে কাপড় জামা বোঝাই, ছাদে ঝুলন্ত বস্তা, চার পায়ে ইঁট দিয়ে উঁচু করা খাট, তলায় হাড়িকুড়ি—বাসনপত্র, পাশে ট্রাংক-স্যুটকেশ, দেয়ালে ক্যালেণ্ডার, মেঝেয় ধুলো। সব কিছুই আগোছাল এলো-মেলো। অসিত কুণ্ঠিত কৈফিয়ৎ দিতে চাইলো, পাশের ঘরটা হঠাৎ খালি করতে হ'ল, তাই—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, অমন অবস্থায় ঘরদোর এমনই হয়। নারায়ণবাবু অসিতকে কৃতজ্ঞ ক'রে দিয়ে বললেন, সত্য ডাক্তার আমার ঘরের লোক। তোমার লজ্জা পাবার কিছু নেই।

ডাক্তারের পাতলা চাপা ঠোঁট সামান্য প্রসারিত হল, তুমি আর আত্মীয়তা দেখিও না। ওটা আমার সয় না।

—কী যে বলো! তুমি হলে গিয়ে আমার—বাকীটুকু হাসিতে উহ্য রেখে নারায়ণবাবু বললেন, তুমি একবার ও ঘরটা দেখে এসো অসিত। ততক্ষণ ডাক্তারে আমাতে একটু কথা কই।

যে প্রয়োজন গুরুতর আর যন্ত্রণাদায়ক, তা এড়ানোর অবচেতন চেষ্টা অমানুষিক নয়, বরং, হয়তো স্বাভাবিক। তবু, নারায়ণবাবুর কথায় অসিত লজ্জিত হয়ে বেরিয়ে গেল। এবং একটু পরেই ফের ফিরে এলো।

—জ্ঞান ফিরেছে। একবার এঘরে আসবেন?

—চলুন। ডাক্তারের ওঠার ভংগীতে ক্লান্তির ছাপ।

বারান্দা ঘুরে ওঘরে যেতে হয়। ঘরটা একটু বড়। একেবারে নিরাভরণ। একটা ছবি, দুটো ক্যালেণ্ডার। কোণে টেবিলের ম্লান নীল আলোয় আবছায়া ঘরটা আরো বড় দেখায়।

মাটিতে বিছানা। দেয়াল মুখী পাশ ফিরে রমা শুয়ে, মাথার কাছে নারায়ণবাবুর স্ত্রী। ওরা ঢুকতেই তিনি ঘোমটা টেনে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে নারায়ণবাবু বললেন, তুমি যেওনা কিন্তু। ওদিকটায় বসো।

ডাক্তার চক্রবর্তী বিছানার ধার ঘেঁষে একটা মোড়ার ওপর বসলেন। অসিতের ভীত চোখে চোখ রেখে একটু হাসলেন। বললেন,

—ভয়ের কিছু নেই। জ্ঞান ফিরেছে তো?

—হ্যাঁ।

—জ্বর আছে নাকি?

—আছে কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না তো। লেপের অন্তরাল থেকে রমার বাঁ হাত মুক্ত করতে করতে অসিত বললো, আপনি দেখুন।

নাড়ী দেখায় ডাক্তার চক্রবর্তীর বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ পেলো না। নারায়ণবাবুকে বললেন, এঁরা দুজনে ঘরেই থাকুন তুমি শোওগে।

অসিত শিউরে উঠলো।

—না ডাক্তারবাবু, আমি ঘরে থাকতে পারবো না। কথা শেষ হবার আগেই অসিত উঠে দাঁড়ালো যেন কেউ ধরে ফেলবে, দোর গোড়াতে থাকবো—দরকার পড়লেই ডাকবেন।

কোন উত্তর না দিয়ে ডাক্তার একটু ঝুঁকে রমার ক্লান্ত হাত তুলে নিয়ে কব্জীর স্পন্দনে মনোযোগ দিলেন। দৃষ্টি নিজের কব্জীঘড়িতে। মুখ নীচু করেই বললেন, ঘরে অন্য কোন আলো নেই?

নারায়ণবাবু বেরিয়ে যাবার পথে ঘরের নীলিমা ঘুচিয়ে বড়ো আলোটা জ্বেলে দিয়ে গেলেন। মাথার ওপরেই একশো পাওয়ারের বাল্‌ব। ধাঁধা লাগে মুহূর্তের জন্য। রমা চোখের পাতাদুটো চেপে মুখ বিকৃত করলো।

ডাক্তারের মুঠি আলগা হলো। বালিশে হাত গড়িয়ে পড়তেই রমা চমকে তাকালো। ডাক্তারের মুখের প্রতি তাকানো সে চোখ আতংকে বিস্ফারিত। রমার দৃষ্টি বেয়ে অসিত ডাক্তারের দিকে তাকালো। সেই দৃষ্টিতেও বিস্ময়ের স্থিরতা। ডাক্তার অস্ফুট স্বরে বললেন, তুমি?

রমা হঠাৎ জোর ক'রে চোখের পাতা জড়ো ক'রে কাঠ হয়ে রইলো। কেমন দুর্বোধ্য লাগে, এত প্রখর আলোতেও অসিতের বুঝতে অসুবিধা হয়। অবাধ্য দৃষ্টি ফের ডাক্তারের মুখে ফিরে যায়। কিন্তু সেখানে আবার প্রফেশনাল ডাক্তার চক্রবর্তী, সেই অন্যমনস্ক কাঠিন্য। নারায়ণবাবুর স্ত্রীকে বললেন, সময় প্রায় হ'য়ে এসেছে, আপনাকে বেশীক্ষণ আটকাবো না। আচ্ছা অসিতবাবু আপনি তা হ'লে বাইরে গিয়ে দাঁড়ান দরকার হলেই ডাকবো'খন। তারপর, অদ্ভুত হেসে ডাক্তার বললেন, খামোকা ঘাবড়ে কি লাভ?

অসিত বাইরে এসে দরজা ভেজিয়ে দিল।

দুই

অনেকক্ষণ ভেতরে কোন সাড়াশব্দ নেই। রমার মৃদু আর্তনাদও না। বাইরে রাত্রি কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে নিঝুম। কিসের প্রতীক্ষায় যেন সবাই রুদ্ধশ্বাস।

শুধু প্রতীক্ষা আর প্রত্যাশা। আদি নেই, অন্ত নেই। না, ভুল হলো, অসিত ভাবলো: প্রত্যাশার সুরু আছে হয়তো কোথাও, শেষ নেই। এক প্রত্যাশার পূর্ণতাতেই জন্ম আরেক প্রত্যাশার। একের পর আরেক ঢেউ এসে বিপর্যস্ত করে দেয়। স্থির হবার অবকাশ কোথায়। ভেসে যেতে যেতে শুধু প্রতীক্ষা থাকে আরেক প্রত্যাশার দ্বীপের।

বারান্দায় হেঁটে হেঁটে অসিত সারা হয়। আজ অনেক হাঁটতে হয়েছে, এখনও বিরাম নেই। হয়তো এ হাঁটা আর ফুরোবে না কোন-দিন। অন্ধকারকে অসিত ভয় করে চিরকাল, আর আকস্মিকতাকে। আশ্চর্য আজকের দিনটা। নাটকীয় হঠাৎ ঘটনায় ভরা। সত্যি কি কোন নাটক অভিনয় হ'তে চলেছে? অসিত ভেবে ঠিক করতে পারে না, এ নাটকের সে অভিনেতা, না দর্শক।

আচ্ছা, ডাক্তারখানার সেই মেয়েটি কে? রেণুর কোন বন্ধু? কিন্তু যে মেয়েটির সংগে মিল মনে হচ্ছে—ঋজু, তীক্ষ্ম আর বাচালতার তো অনেকদিন আগেই বিয়ে হয়ে গেছে। মনে আছে, তার বিয়ের উপহার কিনতে গিয়ে রেণু অনেক টাকা খরচ করিয়ে দিয়েছিল। বাড়ী ফিরে রেণুকে বকুনি দেওয়ায় কী কান্না তার! সেই রাত্রেই উপহার ফেরৎ দেবার জন্য বার হচ্ছিল। অনেক বুঝিয়ে শান্ত করতে হয়েছিল। টাকাও গেল, উল্টে মায়ের কাছে ধমক খেতে হয়েছিল অসিতকে।

অসিত হাসলো।

আজ কতদিন হলো। তখন রেণু স্কুলে পড়তো, তারপর কলেজ গেল, এখন চাকরী করতে হয় তাকে। কিন্তু এখনও রেণুটা তেমনি জেদী আর ছেলেমানুষ রয়ে গেছে। সেদিন রাস্তায় দেখা হয়েছিল। অপর ফুটপাতে ছিল রেণু, অসিতকে দেখে প্রায় ছুটেই রাস্তা পার হয়ে এলো।

—আচ্ছা দাদামণি, তোমার কি আক্কেল বলে কিছু নেই? কতদিন যাও না বলো তো? পুরো এক মাস। মা তো ভেবেই অস্থির।

—এত ঝামেলায় রয়েছি, সময় হচ্ছে না।

—চাকরী?

—এখনও কিছু জোটেনি।

—একটু চুপ করে রইলো রেণু।

—কাল পরশুর মধ্যে একবার যেও।

যেমন তাড়াতাড়ি এসেছিল তেমনি ব্যস্ততায় চলে গেল। ছোট বোনের অভিনয় দক্ষতায় হাসি পায় অসিতের। যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাবেই কথা বলে সবাই। কেউ কোনদিন অভিযোগ করে না, কোন অভিমান নেই, বিদ্বেষ নেই। মা সব কথাই বলেন, শুধু রমার উল্লেখ করেন, না কখনো। ও নাম যেন কেউ জানেই না। চেনে না। সবাই ঘটনাটাকে এত ঠাণ্ডা ভাবে গ্রহণ করেছে প্রথম প্রথম অসিতের কেমন ভয় হোত। এখন সয়ে গেছে।

আজ যে আসছে, তাকে কি মা ঔদাসীন্যে সরিয়ে রাখবে? ছেলে হবে, না মেয়ে? একটা ছেলেমিতে পেয়ে বসলো অসিতকে। পকেট থেকে পয়সা বের করে টস্ করলো। একবার মেয়ে, দুবার ছেলের দিক পড়লো। কিন্তু যদি না বাঁচে? মেরুদণ্ডের কাছটা শিরশির ক'রে উঠলো। যদি আজ রমা মারা যায়। দূর তাই কি হয়? এতবড় ডাক্তার, চেহারাটা তো খুব বড়সড়, কিন্তু খুব নাম করা কি? কে জানে। তাছাড়া ডাক্তারবাবু রমার পূর্ব পরিচিত বলেই মনে হলো। তিনি নিশ্চয়ই খুব যত্ন নেবেন। আচ্ছা রমা তো কোনদিন ডাক্তারের কথা বলেনি। পরিচয় হলো কি করে? সম্ভবতঃ রমা যখন হাস-পাতালের নার্স ছিল, তখনকার পরিচয়। আর এমন কিছু বলার মত কথা নয় বলেই রমা বলেনি।

দরজাটা একটু ফাঁক হতেই ক্রমে আসা বুকের স্পন্দন ফের দ্রুত হলো। রুমালে হাত মুছতে মুছতে ডাক্তার বেরিয়ে এলেন। দরজা বন্ধ করলেন পেছনে।

—এখনও ঘুরছেন?

—কি আর করি।

—চলুন, ওঘরে গিয়ে বসা যাক।

দুজনে পাশের ঘরে এলো। আলো জ্বাললো অসিত। একটা সিগারেট ধরিয়ে ডাক্তারবাবু চুপ। একটু চিন্তিত যেন। অনেক প্রশ্ন মনে জমিয়ে রেখে অসিতও নির্বাক। আড়চোখে একবার ডাক্তারের

পুরুলেন্সের আড়ালে দুর্বোধ্য চোখের দিকে তাকিয়েই দৃষ্টি নামিয়ে নিতে হলো। বোঝা যাচ্ছে না ডাক্তার তার দিকে তাকিয়ে আছেন, না অন্যদিকে। কেনই বা হঠাৎ বাইরে এলেন, কেনই বা এমন চুপ করে আছেন, রমার অবস্থা কেমন ইত্যাদি হাজারটা সংগত প্রশ্নে বিব্রত হলেও জিজ্ঞাসা করা অভদ্রতা মনে করে অসিত নিজেই ভয়াবহ সব উত্তর সৃষ্টি করতে লাগলো। কথা বলার জন্য প্রতীক্ষা করার মত বিশ্রী ব্যাপার আর নেই। ভারী বিরক্ত লাগে।

—আপনাদের বিয়ে হয়েছে কবে? ডাক্তারের ভারী গলার প্রশ্নে চমকে ওঠে অসিত। আর প্রশ্নটাও কেমন যেন বে-আব্রু। অভ্যস্ত উত্তরটা চট করে মনে আসতে চায় না। উত্তর দিতে তাই একটু দেরী হলো অসিতের।

—দু বছর।

—আপনারা আলাদাই থাকেন?

—হ্যাঁ।

—রেজিষ্ট্রী ম্যারেজ?

—হ্যাঁ।

—ও আপনাদের সংগেই কাজ করতো?

—হ্যাঁ।

—চাকরী গেল কিসে?

ক্রমাগত ইতি বাচক শব্দ ক'রে কেমন যেন বিব্রত মনে হয়—অনেক কথায় উত্তর দেবার সাহসটুকুও উবে গেল অসিতের। যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, ছাঁটাই।

আবার স্তব্ধতা।

কোন বাইরের ডাক্তারের পক্ষে, যাঁর সংগে পরিচয়ের কিছুমাত্র সুযোগ ঘটেনি, এমন ঘনিষ্ঠ প্রশ্ন অত্যন্ত অনুচিত। এবং এ রকম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া নিশ্চিন্ত বোকামি। অসিতের রাগ হয়। ডাক্তার আঙুলের টোকায় সিগারেট বাইরে ফেললেন। শূন্য অন্ধকারে লাল আগুনের অর্ধবৃত্ত। সেদিকে তাকিয়ে থাকলে ভ্রম হয় বুঝি স্থির হয়েই রয়েছে লাল সূক্ষ্ম রেখাটা—ডাক্তারের কাছ থেকে বাইরের অন্ধকারে বিস্তৃত। অসিত অর্থহীন দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইলো।

—রমা কেমন আছে ?

—এখনও ভয় পাবার মত কিছু ঘটে নি। ডাক্তার ধীরে ধীরে বললেন, আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। আমিই যেতাম—কিন্তু এখন আমার যাওয়াটা ঠিক হবে না।

ভূমিকা শুনে অসিত শংকিত হলো।

—আপনি কিছু তুলো কিনে আনুন।

—বোরিক তুলো ? বলেই অসিতের আশংকা হলো, হয়তো ডাক্তার বলবেন—নইলে কি তোষকের তুলো ? না, তেমন কিছু বললেন না।

—তাড়াতাড়ি আনবেন। একটু পরেই দরকার লাগবে মনে হচ্ছে। ডাক্তার প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে প্রশ্ন করলেন,—কাছে টাকা আছে তো ?

আগে হ'লে অসিত রূঢ় উত্তর দিত, আজ হেসে মাথা নাড়লো, আছে।

আবার রাস্তা। অসিতের পায়ের শব্দে বাইরের স্তব্ধতা চমকে ওঠে। বিশ্রী। পা চেপে চললে তাড়াতাড়ি চলা যায় না, পা'টাও ক্লান্ত হয় দারুণ। শব্দ আর পা সামলাতে সামলাতে অসিত বড় রাস্তায় এসে পড়লো।

বৃত্তের মধ্যে লাল ক্রশ আঁকা অনেক সাইনবোর্ড দেখা যায় দিনের আলোয়। বড় অক্ষরে তাদের গায়ে লেখা থাকে দিবারাত্রি খোলা থাকার প্রতিশ্রুতি। সেই সব বোর্ডগুলো কি রাত্রে উল্টে দেওয়া হয় ? রাস্তার এপারে ওপারে যতদূর দৃষ্টি চলে, শুধু বস্ত্রালয় আর মিষ্টান্ন ভাণ্ডার। এবং বন্ধ।

একটা ডাক্তারখানা। ফিকে সবুজ কাঠের দরজায় লোহার পাতের গুণচিহ্ন। মোটা ভারী একাধিক তালার নিশ্চিন্ত প্রতিরোধ। চোর ডাকাত কাছে ঘেঁষতে পারে না, আর খদ্দের। দোকানের অন্তরে বাইরে অন্ধকার। অসিত দাঁড়ালো না, পদক্ষেপ দ্রুততর করলো। এই বয়সে ছোটা যায় না, আর নির্জন শীতের রাতে সেটা অনুচিত বলেই সেই সামান্য প্রভেদটুকু চলার মধ্যে বজায় রাখতে হয়।

জোরে হাঁটা আর ছোটার মধ্যে পার্থক্য ভুলতে হয়েছিল একদিন, এমনি এক রাত্রেই, যখন বয়স ছিল অনেক কম। পড়তো থার্ড ইয়ারে।

কিংবা ফোর্থ ইয়ারও হ'তে পারে। ঠিক মনে নেই। শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড় চষে ফেলতে হয়েছিল সেদিন। মাত্র একটি ইনজেকশন। একটি মানুষের জীবন। ভয়ানক গরম ছিল, হাওয়া পলাতক। বার বার ঘাম মুছে রুমাল ভিজে জবজবে হয়ে গিয়েছিল। জামা কাপড়ের অবস্থা শোচনীয়। নিজের দিকে নজর দেবার কথা আজকাল মনে হয়, তখন সে অবস্থা ছিল না। একটা স্থির আদর্শের আলোয় চলতে হোত অন্যদিকে দৃষ্টি দেবার সময় কোথায়?

এখন ভাবলে হাসি পায়। সেই আলোটা চোখের ওপরেই সম্ভবতঃ তীব্র হয়ে পড়েছিল, তাই পথটা দেখা যেত না। নইলে, কেন সেদিন বুঝতে পারি নি—সেই মেয়েটি তাকে ভাল বেসেছিল। ঔদাসীন্যে অপমানিতা মেয়েটি চরম প্রতিশোধ নিয়েছিল নিজের ওপরেই, একটি লম্পটের হাতে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে। কুমারী মেয়ের ছেলে হবে শুনে, সবার সংগে, অসিতও ধিক্কার দিয়েছিল মনে মনে। এবং এই আচরণের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যায় খুব একটা তৃপ্তি পাওয়া গিয়েছিল। তাই, যখন বাপ ভাইয়ের ছেলে নষ্ট করার অপচেষ্টায় তার জীবন শেষ প্রান্তে উপস্থিত হ'লো—তখন রাত্রে পাগলের মত ইনজেকশন খুঁজতে কিছুমাত্র অনুশোচনা হয়নি অসিতের। মেয়েটিকে শুধু একটা মানুষ বলে মনে হয়েছে—তাকে বাঁচাতে হবে, এটা তার কর্তব্য। অনেক ছুটোছুটি, বহু ঝগড়াঝাটির পর ওষুধ মিলেছিল। শেষ রাত্রে যখন পাড়ায় পৌঁছল অসিত, তখন সে ইনজেক্‌শনের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। মেয়েটি বাঁচে নি

দুই প্রান্তের দুই ঋতু। শীত আর গ্রীষ্ম। এই শীতের রাত্রি শেষে কি আছে কে জানে। ক্লান্তির শেষ ধরণে পৌঁছে অবশেষে একটি দোকান পাওয়া গেল যার বন্ধ দরজার ফাঁকে ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা যায়। ভাল করে সাইন বোর্ডখানা পড়লো অসিত। ডাক্তারখানাই বটে। দরজায় একটু জোরেই ধাক্কা দিল। পর পর কয়েকবার।

ঘুম জড়ানো অনিচ্ছুক সাড়া এলো ভেতর থেকে।

—একবার দোরটা খুলুন। প্রয়োজন আছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। ঘরের ক্ষীণ আলো তীব্র হলো। দরজা একটু ফাঁক করে আপাদ মস্তক মুড়ি দেওয়া একটা বিরক্ত মূর্তি উঁকি দিল।

—কে ? এতরাত্রে কি চাই ?

—ডাকাত নই। কিছু তুলো দরকার।

—ভেতরে আসুন।

দরজার ফাঁক দিয়ে গ'লে অসিত ভেতরে ঢুকলো। শোকেস আর আলমারীতে ঠাসা। সে গুলো ঠাসা শিশি আর প্যাকেটে। বাইরের খোলা রাস্তাটা নির্মম—দোকানটা উষ্ণ, বেশ নিশ্চিন্ত আশ্বাসের মত। লোকটি কম্পাউণ্ডার না পাহারাদার ? বেচাকেনার অধিকার আছে তো। অসিতের সন্দেহ হয়।

—কি চাই বললেন ?

—বোরিক তুলো।

পেছন-ফেরা লোকটি ফিরলো। ফিরে বিস্মিত।

—আরে চৌধুরীবাবু যে ? তাই বলি, গলাটা এত চেনা চেনা লাগছে কেন। গলাটা ভেঙেছে বলে মনে হচ্ছে। ঠাণ্ডা লাগিয়েছ বুঝি ? এত রাত্রে তুলো ?

অসিতের বিস্ময়ের পরিমাণও নেহাত কম নয়। পুরানো পাড়ার কম্পাউণ্ডার চারুদা। অনেক আগে, মাঝে মাঝে, সন্ধ্যায় অসিত চারুদার ডিসপেন্সারীতে যেত ইংরেজী কাগজের জন্য। পড়তো, কিছু কিছু নিয়ে আসতো পোষ্টার লেখার প্রয়োজনে। হাস্যকর যুক্তি দিয়ে চারুদা রাজনৈতিক তর্ক করতো। মনে মনে হাসলেও অসিত সব কথার উত্তর দিত তার। কেমন যেন একটা প্রীতির সম্পর্ক ছিল দুজনের মধ্যে। এই সেই চারুদা যে বীণার ভাইকে ছেলে নষ্ট করার ওযুধ বাতলে দিয়েছিল, আর অসুস্থতায় প্রাথমিক চিকিৎসা করে অবস্থা গুরুতর করে তুলেছিল। বীণার মৃত্যুর পর অসিত অত্যন্ত কঠিন ভাষায় তাকে ধমকেছিল। কিন্তু পাড়ার ছেলেরা যখন ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশে খবর দেবার কথা ভাবছিল তখন অসিতই তাদের থামিয়েছিল। চারুদাকে আঘাতের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল।

—চারুদা! ওখানকার দোকান কি হলো, এখানে কত দিন ?

—মাস ছয়েক। এক নতুন ডাক্তার দোকানটা কিনে নিল, ব্যাটা মাইনে কড়ি দেয় না। কি হবে শ্রমদান যজ্ঞ করে ?

—এখানে ?

—বড় দোকান, এখন অবধি দিচ্ছে তো। আর না দেয় তো মালপত্র ঝেড়ে দিয়ে একদিন কেটে পড়বো।

—এখানেই থাকো ? বাড়ী যাও না ?

—বাড়ী কোথায় যে যাবো ? কম্বলের ভেতরে চারুদা হাসলো, তোর বৌদি মারা গেছে দেড় বছর, ছেলেটাকে পাঠিয়েছি ওর মাসীর বাড়ী। বেশ আনন্দেই আছি।

বিস্ময় আর আঘাত। বৌদি নেই চারুদা আছে, এটা কেমন হাস্যকর মনে হয়।

—বসবি না ?

—গল্প করতে এসেছি ভেবেছ ? কিছু তুলো দাও। পরে আরেক দিন আসবো।

—তুলোর কি দরকার ?

—আছে। তাড়াতাড়ি দাও তো।

হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে উঠলো অসিত। চারুদা তুলো বের করলে অসিত পয়সা দিতে গেল। চারুদা নিল না।

—পরে দিয়ে যাস এখন কোথায় রাখবো।

অসিতের পুনরাগমন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে চায় চারুদা। অসিত হাসলো। প্যাকেটগুলো আলোয়ানের ভেতর পুরে বাইরের দিকে পা বাড়ালো।

—চলি চারুদা। কাল পরশুই আবার আসবো তখন সব কথা শুনো সান্ত্বনা দেবার মত অসিত বললো, আজ সত্যি খুব তাড়া আছে। নইলে এত শীতে কেউ বার হয় ?

চারুদা নির্লিপ্ত হেসে মাথা নাড়লো। দরজা বন্ধ করলো।

আবার পথ। অন্ধকার। কুয়াশা। শীত। অনেক দেরী হয়ে গেল। হয়তো ডাক্তারবাবু প্রয়োজনের সময় তুলো না পেয়ে বিরক্ত হচ্ছেন। হয়তো বা, হয়তো বা তুলোর প্রয়োজনই ফুরিয়ে গেছে। প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

অসিত প্রায় ছুটতে শুরু করলো।

তিন

বাড়ী পৌঁছে জানা গেল বেশী দেরী হয় নি। মাত্র কুড়ি পঁচিশ মিনিট। সময় বেশী না লাগায় নিশ্চিন্ত হতে গিয়ে ফের বুকটা ধড়াস করে উঠলো। বারান্দার অন্ধকারে নারায়ণবাবু এবং তাঁর স্ত্রী নীচু স্বরে কথা কইছিলেন, অসিত ঢুকতে তার দিকে ঘুরে তাকালেন।

—তুলো এনেছো?

নিঃশব্দে মাথা নাড়লো অসিত। প্যাকেট গুলো নারায়ণ বাবুর হাতে দিল। নারায়ণ বাবু স্ত্রীকে বললেন, গরম হাড়িটা নিয়ে এসো।

—রমা এখন কেমন আছে?

জিজ্ঞাসা করতেই মনে হলো, সে যেন একেবারে অপরিচিত। অন্য কেউ। কুশল জিজ্ঞাসাতেই কর্তব্য শেষ। যেন কতদিন এই নামটা অসিত উচ্চারণ করে না, করতে ভুলে গেছে।

—ডাক্তার বললে আশংকার কোন কারণ নেই। তবে যন্ত্রণা হচ্ছে বোধ হয়। স্রাবও হচ্ছে একটু একটু। এ রকম চললে রক্ত দিতে হতে পারে। রক্ত কেনাও তো এক হ্যাঙ্গাম। আচ্ছা বাবাজী একটি কথা জিজ্ঞাসা করবো?

আজকের রাতটাই এমনি—শংকিত হবার অনুভূতিটাও যেন নষ্ট হয়ে গেছে। নির্বোধ চোখে তাকালো অসিত।

—যবে থেকে চাকরী গেছে, তখন থেকে তোমরা কি খাওয়া দাওয়া একদম ছেড়ে দিয়েছ? মেয়েটার শরীর তো একেবারেই ভেঙ্গে গেছে। আমাদের বলোনি কেন কোন দিন? লজ্জা?

এমন করে কেউ অনেকদিন অনুযোগ করে নি। মনটাও দুর্বল হয়ে পড়েছে। অন্তরঙ্গতায় চোখে জল আসতে চায়। অসিত লজ্জিত হাসি হাসার চেষ্টা করলো। কিন্তু বড় করুণ দেখালো সে হাসি।

—তোমাদের এ ভারী অন্যায়। নারায়ণ বাবু ঘরের দিকে যেতে যেতে বললেন, ভয় পেয়ো না সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

ভয় না পাবার আশ্বাস তখনই দেওয়া হয়, যখন ভয় পাবার যথেষ্ট

কারণ ঘটে। একা বারান্দায় অসিত মোটেই আশ্বস্ত হ'তে পারলো না।

ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে গেছে রমা। ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়েছে। কোনদিন কিছু বলে নি। বললেই বরং অসিত অবাক হতো। নিজের কথা অপরকে বলার অভ্যাস ওদের নেই। এ একটা অকথিত অনুশাসন। দুজনেই মেনে চলে। মনে হ'তো, স্থির এক আদর্শের অনুসরণেই দুটো জীবন, যারা খুব কাছাকাছি থাকার প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ়বদ্ধ, সার্থক হয়। যুক্ত হয়েও মুক্তি সম্ভব। কিন্তু এখন সন্দেহ হয়, হয়তো বা এপথ শুধু দায়িত্ব এড়াবার চোরাগলি। স্রোতের জলে অবগাহন নয়, শুধু আলতো ডানায় জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে হালকা হাওয়ায় ভেসে বেড়ানো। রমা যদি আজ নিঃশেষে ফুরিয়ে যায়, যদি আর না ফেরে, অসিত ভাবলো—বোধহয় এই প্রথম তার মনে হলো : তবে এই মৃত্যুর দায়ভাগ অস্বীকার করা যাবে কোন যুক্তিতে?

না, কোন যুক্তি নেই। শীতে স্তব্ধ অন্ধকারের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে অসিত নিজেকে বিচার করে। নিস্তার নেই। নিজের কাছ থেকে রেহাই নেই।

গত ছ'মাস চাকরী নেই দুজনের। টুইশন-নির্ভর জীবনের মান নেমেছে ক্রমে। অল্প অল্প ক'রে হাতের টাকা ফুরিয়েছে। আর সেই সংগে বাতিল হয়ে গেছে প্রত্যহের অনেক প্রয়োজন। দুজন দুজনের প্রতি নিঃশব্দে তাকিয়েছে, মৃদু হেসেছে, কথা বলেছে—যেন কিছুই হয়নি, স্বীকার করে নিয়েছে, চেষ্টা করেছে চাকরীর। অনেকবার মনে হ'লেও, অসিত কখনোই রমাকে জিজ্ঞাসা করেনি—এ অবস্থায় তার কি কর্ত্তব্য। জিজ্ঞাসা করলে সম্ভবতঃ রমা অবাক হ'তো।

রমার স্বাস্থ্য ভাল—এমন ধারণা ছিল। কিন্তু পাথরও যে ক্ষ'য়ে যায়—সেকথা সম্ভবতঃ অজানা ছিল। আজ এক ভয়াবহ সম্ভাবনার কিনারে দাঁড়িয়ে নিজেকে নির্দয় সমালোচনায় বিধ্বস্ত করতে ইচ্ছে হ'চ্ছে অসিতের। এই শীত, জমাট অন্ধকার, কুয়াশা—এদের ওপর হাত নেই, কিন্তু যা নাগালের মধ্যে তা' এড়িয়ে যাওয়া—আদর্শের খাতিরে কিংবা ভয়ে—অক্ষমনীয় অপরাধ। যে জন্ম যন্ত্রণায় রমা মুমূর্ষু, যার আসার

আশায় এই রাত্রির ক্লান্তি, এই অসহ্য প্রতীক্ষা—তার আগমন কি সত্যি খুব প্রয়োজন ছিল ? এ জন্মকে বিলম্বিত করা কি একেবারেই কঠিন ছিল ? সাধ্যাতীত ?

বেকার মধ্যবিত্তের পিতৃত্বের দাবী নিছক বিলাসিতা—এ কথা অপরকে বহুবার অসিত বলেছে। কিন্তু নিজের বেলা ? স্ববিরোধিতা যেন সহজাত—এ কথাই অসিতের মনে হ'লো। কোনখানে কোন মিল নেই। লম্পট, কামুক, অসামাজিক—বিশেষণগুলোর নিজের প্রতি প্রয়োগ খুব অসার্থক নয় ভেবে বেশ তৃপ্তি পাবার চেষ্টা করলো অসিত।

তবে একেবারে চেষ্টা করেনি অসিত—তা সত্য নয়। এ ব্যাপারে রমার দায়িত্বও অনস্বীকার্য। বহুবার সে রমাকে সাবধান করেছে, রমা শোনেনি। হেসে বলেছে, ওসব তত্ত্ব সবকারী প্ল্যান প্রোগ্রামেই শোভা পায়, আব বড়জোর তর্কের খাতিবে স্বীকাব ক'রে নেওয়া যায়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে জোরাল অন্য যুক্তি আছে। অসিত সে যুক্তি অনেকবার শুনেছে। কিছুটা মানতে হয়েছে, বেশীর ভাগই মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। রমা কথা বলে, কাজ করে অদ্ভুত এক অপরিচিত বিশ্বাসের শক্তিতে—অসিত বুঝতে পারে না, চেনে না তার রূপ। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, রমা আজও দুর্বোধ্য রয়ে গেছে তার কাছে। দুজন পরস্পরকে গভীরভাবে চেনাব প্রতিশ্রুতিতেই কাছাকাছি এসেছিল। বুঝতে পেরেছে-এই ছিল এতদিনকার প্রত্যয়। এখন, অবিশ্বাস না করলেও, নিজের প্রতি খুবই সন্দেহ হয়। চৌকাঠের এপারেই বুঝি থাকতে হয়েছে আজও।

হঠাৎ চাপা, তীক্ষ্ণ আর্তনাদে অসিত শিউরে উঠলো। সমস্ত চিন্তা সমস্ত অনুভূতি সমস্ত যন্ত্রণা মুহূর্তে স্থির হ'লো—জমাট বেঁধে রইলো একটা করুণ আর্তিতে। বমা সাহায্য চাইছে, বাঁচতে চাইছে—যে রমা তার জীবনের সান্ত্বনা, যে রমাকে সে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে অজস্র গ্লানির মধ্যে। ধীরে ধীরে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো অসিত। দরজায় হাত রেখেও সরিয়ে নিল। ভয় করে। আতংক। নপুংসক বোধহীনতায় চিন্তা ক্ষমতাও যেন নিঃশেষে লুপ্ত। ওপারে যন্ত্রণা, এপারের অন্ধকারে অসিত সেই যন্ত্রণার অব্যক্ত ভয়াবহতায় নিশ্চল।

এই কি মৃত্যু ? রমা কি আজ মারা যাচ্ছে ? নিজের কাছেই দুর্বোধ্য

লাগে প্রশ্নটা। অবিশ্বাস্য। যদিও চিরকাল বেঁচে থাকা কারোর সচেতন কামনা নয়, তবু একটা অবচেতন প্রয়াস আছে। তা' অনিবার্য। তাই মৃত্যু আকস্মিক। আর আকস্মিকতাকে মানুষ ভয় করে চিরদিন।

দুঃখ বেদনা মৃত্যুর, সম্পূর্ণ না হলেও, আংশিক রূপ অসিতের অপরিচিত নয়। সব কিছুকেই নির্লিপ্ত স্বীকৃতিতে গ্রহণের শক্তি আছে বলেই তার ধারণা ছিল। কিন্তু না। কিছু দিন ধরেই এ বিশ্বাসের ভিত্তি দুর্বল হয়ে আসছিল, আজ বুঝি তা খান খান হয়ে গেল। জীবনের প্রতি মুহূর্তই যেহেতু অভিনব, অতীতের শিক্ষা খুব একটা কাজে লাগেনা অনেক সময়েই। যখন রমা ছিল না, এই অভিজ্ঞতাও তখন ছিল অনুপস্থিত। আজ রমার আর্তনাদ জীবনের মূল ধরে নাড়িয়ে দিয়ে জানিয়ে দিল : জন্মান্তর সত্য। প্রত্যেক ঘটনায় নবজন্ম। নিরবচ্ছিন্ন সময়স্রোতে পূর্বজন্মের মৃত্যুকে, নতুন জন্মের যন্ত্রণাকেই অভিজ্ঞতা নাম দিয়ে মানুষ জীবনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। আজ রাত্রের অসিত চৌধুরী আর সেই পরিচিত মানুষটি নেই। এ এক আশ্চর্য অনুভূতি।

প্রত্যেক জন্মই আরেক মৃত্যুর সম্ভাবনায় অশান্ত। অসিতের জন্মক্ষণেও সে শুনেছে, মায়ের আশা সবাইকে ছাড়তে হয়েছিল। তার নিজের সন্তানের আসন্ন জন্মের মূল্য কি রমার জীবন দিয়ে শোধ হবে ? অসিতের দেহমন এক নির্ব্বাক প্রতিবাদে দৃঢ় হয়ে আসে।

ঘরের দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। এক ফালি আলো। ফের বন্ধ হ'লো। অন্ধকার। নারায়ণবাবু কাছে এলেন। অসিত নিজেকে গুছিয়ে নিল।

—কান্না শুনতে পাওনি ? নারায়ণবাবুর স্বরে খুশীর আমেজ, ছেলে হয়েছে।

—কিছু শুনতে পেলাম না তো।

এত আড়ম্বর, এত যন্ত্রণার ভূমিকা করে এত সহজেই একটা মানুষ পৃথিবীতে এসে গেল !

—এত ভাবছো কি। বাবা হয়েছো ছেলের মুখ দেখবে এসো।

—না, না। এখন নয়—পরে।

—লজ্জা করছে ? প্রথম প্রথম সকলেরই করে। হাসি হাসি মুখে নারায়ণবাবু একটু চুপ থেকে বললেন, তোমার বংশধর চিরকাল, তোমায়

বাঁচিয়ে রাখবে। সোজা ব্যাপার ? ভাবতে পারো, জলজ্যান্তো একটা গোটা মানুষ ? সোজা ব্যাপার ? এখন ঠাকুরের কৃপায় ছেলেটা বেঁচে থাকে, মানুষ হয়।

অসিত বুঝতে পারে না, অনুভব করতে পারে না এ কথার তাৎপর্য। অতিদূর ভবিষ্যতে, যখন সে থাকবে না রমা থাকবে না, তখনও তারা কারোর মধ্যে অলক্ষ্যে বেঁচে থাকবে, যুগ যুগ ধরে তাদের স্পর্শ প্রবাহিত হবে—এ ঠিক ভাবতে পারা যায় না। বোঝা যায় না।

—কটা বাজে ? অসিত ক্লান্ত প্রশ্ন করলো। বাইরে এখনও অন্ধকার গাঢ়, কুয়াসা জমাট। স্থির, স্তব্ধ, অচঞ্চল আকাশে সময় এখনও দুর্বোধ্য।

—রাত শেষ হ'য়ে গেছে। জন্ম সময়টা লিখে রাখো—চারটে পঞ্চাশ।

ঘরে গিয়ে একটা কাগজে অসিত সময়টা লিখলো। লিখে রাখার সত্যি কোন দরকার আছে কিনা জানা নেই, তবে নিজের সন্তানের জন্ম সময় লেখার মধ্যে অননুভূতপূর্ব একটা শিহরণ আছে, একথা অনস্বীকার্য। অনেক কিছুই লিখতে হয়েছে, এমন লেখা এই প্রথম।

আকাশে যখন ফিকে ঘোলাটে রং লাগলো, তখন ডাক্তারবাবু ঘর থেকে বার হলেন। ক্লান্ত ফোলা ফোলা চোখ, গম্ভীর। সাবানে কনুই অবধি ধুলেন। ঘরে এসে একটা সিগারেট ধরালেন। শেষ না হওয়া অবধি নারায়ণবাবু এবং অসিত দুজনেই চুপ। পাশের ঘরে শিশুর কান্নার মৃদু শব্দ।

— আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি অসিতবাবু।

—কিন্তু আপনাকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা আমার নেই। দুশ্চিন্তার ভার অনেকটা লাঘব হওয়ায় অসিত যেন নিজের মধ্যে আবার ফিরে আসতে পারছে। কথার উত্তর ভাবতে আর বেশীক্ষণ লাগছেনা।

—চা খাবেন, ডাক্তারবাবু ?

—পেলে মন্দ হয় না।

সারারাত ডাক্তার কিছু খায়নি ভাবতে গিয়ে অসিতের মনে পড়লো, সেও অভুক্ত। উঠলো। নিজেকেই চা করতে হবে।

চার

অসিত ডাক্তারবাবুকে পৌঁছতে তাঁর বাড়ী অবধি গিয়েছিল। দুদিন চলার মত ওষুধ ডাক্তার দিয়েছিলেন। আর বলেছিলেন, পরশু আসবেন ওষুধ পালটে দেব।

অসিত মনে মনে বারবার কৃতজ্ঞতা জানালেও মুখে আর বিশেষ কিছু বলেনি। মৌখিক নিবুদ্ধিতা প্রকাশের চেয়ে আচরণে বিনয় ফুটিয়ে তোলাই বিধেয় মনে হয়েছিল। চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়াতেই ডাক্তার বাবু ড্রয়ার খুলে দুটো দশ টাকার নোট বের করে বলেছিলেন, রাখুন।

—কি হবে ?

—কাজে লাগবে।

—না, না, তাই কি হয়। অসিত, ডাক্তারের বদান্যতায় নয়, এ রকম আকস্মিকতায়, বিমূঢ় হয়ে বলেছিল, আপনি যা করেছেন সেই ঋণ আগে শোধ হোক।

ডাক্তার চক্রবর্তী সকাল বেলার নির্জন ডিসপেন্সারী ঘরটাকে চমকে দিয়ে হেসে উঠেছিলেন, অনেক কিছু করেছি বলে মনে হচ্ছে নাকি ? দেখবেন, পরে আবার দায়িত্ব পালন করেনি বলে দোষ দেবেন না যেন।

যেমন স্বাভাবিক ভাবে ড্রয়ার খুলেছিলেন, তেমনি নির্লিপ্ততায় নোট দুটো রেখে ডাক্তার বললেন,

—সেন্টিমেণ্টাল। প্রয়োজন হলেই চাইবেন।

বাড়ী ফেরার পথে বারবার অসিতের মনে হচ্ছিল : দায়িত্ব ? ডাক্তারিতেই কি ডাক্তারের দায়িত্ব শেষ হয় না ? প্রথম পরিচয়ে ডাক্তার চক্রবর্তীকে রহস্যময় মনে হয়েছিল—এখন দুর্বোধ্য।

এই দুদিন খুব কমই ও ঘরে গিয়েছে অসিত। যা করবার সব নারায়ণবাবুর স্ত্রীই করেছেন। রমার সামনে যেতে কেমন সংকোচ হয়। হয়তো লজ্জা। বাচ্চাটার দিকেও ভাল করে তাকায় নি। এ রকম দু'য়েকদিনের বাচ্চা অসিত কোথাও দেখেছে কিনা মনে করতে পারে

না। অবাক লাগে, হাসিও পায়। এই শিশুই তাকে বাবা বলে ডাকবে, আর রমাকে মা ?

দুপুর যতই কোমলতর হয় ততই মনটা খচ্‌খচ্‌ করে। সন্ধ্যায় ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। দ্বিধা, ডাক্তার লোক খারাপ বলে নয়, বরং বেশীমাত্রায় ভাল বলেই—তাঁর সামনে নিজের ব্যক্তিত্ব কেমন বিবর্ণ মনে হয় !

ঘরে ঢুকে অসিত একটু ইতস্ততঃ করলো। রমা পাশ ফিরে শুয়ে, ঘুমোচ্ছে কিনা বোঝা যায় না। বুকের কাছে কাপড়ের পোঁটলার মত বাচ্চাটা প্রায় অদৃশ্য।

—ঘুমোচ্ছ ?

ধীরে ধীরে রমা পাশ ফিরলো। ক্ষীণ হাসিতে ঠোঁট টানটান হলো।

—না। তুমি ঘুমিয়েছিলে নাকি ?

—একটু। ওষুধগুলো আছে, না ফুরিয়েছে ?

—রাত্রের মত আছে। কিন্তু আর ওষুধ দিয়ে কি হবে ?

—খাবে। ডাক্তারবাবু বলেছেন, কম ক'রে দুমাস খেতে হবে এখনও।

—কিচ্ছু দরকার নেই। ভালই আছি যখন, শুধু শুধু পয়সা খরচ করার কি দরকার ?

—খরচ হচ্ছে কোথায় ? ডাক্তারবাবুই দিচ্ছেন তো।

রমার দৃষ্টি হঠাৎ কেমন কঠিন মত হয়ে এলো। কিছুক্ষণ চুপ। বললো, এবং যেন শেষবারের মত জানিয়ে দিলো,—ডাক্তার ? নিচ্ছ কেন ? আর নিয়ো না।

—রাগ করছো কেন ? ডাক্তারবাবুর মত লোক হয়না, আশ্চর্য মানুষ।

—জানি। কিন্তু তার কাছে আর যেও না।

—কিন্তু যিনি এত উপকার করলেন—

—সেজন্য কৃতজ্ঞতার অভাব হবে না। আরও উপকার নিয়ে আরও কৃতজ্ঞ হওয়ার কোন মানে হয় ?

—কিন্তু আজ যে যেতে বলেছেন। না গেলে অভদ্রতা হবে না ?

রমা নিরুত্তর। স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো শুধু। অসিত হাসলো।

—কি যাবো তো ?

—জানি না। যা ভাল বোঝ কর।

রমা পাশ ফিরলো। পোঁটলাটার গায়ে গরম কাপড় ভাল করে জড়ালো। অসিত বুঝলো, আর কথা বাড়ানো বৃথা। ডাক্তারের কাছে যেতেই হবে। রমার বিবেচনায় সায় দিলে রমাকে বাঁচানো মুসকিল। আর বাচ্চাটাকেও।

সাড়ে পাঁচটা বাজতেই অন্ধকার। ডিসপেন্সারীতে ঢুকতেই সীতা অভ্যর্থনা জানালো, আসুন। ভাল আছেন ?

বিরূপ হতে গিয়ে আক্রান্ত অসিত মাথা নাড়লো, ডাক্তারবাবু ?

—ওপরে আছেন। বসুন।

—বসতে হবে কি অনেকক্ষণ ?

—না, না, এক্ষুনি আসবেন। ওপরে রোগী দেখতে গেছেন।

—ওপরে রোগী ?

—একটা ক্লিনিক আছে, জানেন না ?

—আছে নাকি ? জানতাম না।

—আপনি কি ? এতদিন এলেন, সাইন বোর্ডটা দোতালার বারান্দায় দেখেন নি ?

—খেয়াল করিনি। দেখলেও বোধহয় ভেবেছি ডাক্তারখানার নাম ওটা।

—এতটুকু ডাক্তারখানার অতবড় নাম ? অনেকক্ষণ ধরে সীতা রীতিমত খিলখিল করে হাসলো, এবং এতে এত কি হাসির আছে বুঝতে না পেরে অসিত বিরক্ত হ'লো।

—বাচ্চা কেমন আছে ?

—ভাল।

—মা ?

—ভাল।

—রমাদি কি এখন ছুটিতে ?

—সবাইকেই চেনেন দেখছি।

—সীতা হাসলো, চিনি। ভাল করে চিনি না কাউকেই।

—কিন্তু আমি আপনাকে একেবারেই চিনতে পারছি না।

—কারণ আপনি আমাকে কোনদিনই চেনেন না, তাই।

—এবার চিনবো, কি বলেন?

—চিনবেন? সীতা এবার গোয়েন্দা গল্পের নায়কের মত বললো, তবেই তো বিপদ।

আর কথার খেলা ভাল লাগছেনা। ঘড়ির কাঁটা ওপরে নীচে সরল রেখায় টানটান। এখনও ডাক্তারের দেখা নেই। মায়ের সংগে দেখা করতে যেতে রাত হবে আশংকা হচ্ছে। বোধহয় সীতারও ভাল লাগলো না খেলা করতে। সেও কি ঘড়ি দেখলো?

—রমাদির ছুটি কতদিনের?

—একেবারে ছুটি।

—মানে?

—চাকরী নেই।

—আপনার নেই শুনেছিলাম।

—রমারও নেই।

—কি করেন—টিউশনি?

অসিত স্থির দৃষ্টিতে তাকালো। উত্তর দিল না।

প্রশ্নের অনৌচিত্য সম্পর্কে বিন্দুমাত্র চিন্তা না করেই সীতা ফের বললো,

—আমার হাতে একটা ভাল টিউশনি আছে। করবেন?

—ট্যুইশন? ভুল সংশোধনের মত উচ্চারণ ক'রে অসিত কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। ইচ্ছে হলো জেনে নেয়, কোন ক্লাসের ছাত্র, কত দেবে, সপ্তাহে ক'দিন, কোন বেলা, কত ঘণ্টা ইত্যাদি। কিন্তু তবু অসিত চুপ ক'রেই রইল।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। ডাক্তার নামছেন বোধ হয়।

—কি? করবেন কিনা বললেন না তো?

—পরে জানাবো।

ডাক্তার ঘরে ঢুকলেন।

—জানাতে দেরী করবেন না। সীতা উঠে ভেতরে চলে যাবার আগে ডাক্তারকে বললো, আজ কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি যাবো।

—কতক্ষণ? চেয়ারে বসতে বসতে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন।

—এই কিছুক্ষণ। সত্যি কথা বলতে ভাল লাগলো না অসিতের।

—সব আছে কেমন ?

—ভালই বোধহয়। রমা তো কিছু বলে না—

—বলেনা ? কেন ?

—অভ্যাস নেই আর কি।

—যখন বলে তখন বুঝি ফাইনাল ?

অসিত হাসলো।

—আপনারা বেশ আছেন। ডাক্তার স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, অবশ্য বেশ থাকাটা সব সময়েই আপেক্ষিক।

খুবই শংকিত হবার মতো কথা। আজ কাল ডাক্তার মাত্রেই লেখক—ইনি আবার দর্শন সুরু করলে মায়ের সংগে আজ দেখা না হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল হ'য়ে উঠবে। অসিত তাড়াতাড়ি বললো, ছ দিন বোধহয় রমার পেটটা ভাল যাচ্ছে না। এর জন্যে কি কোন—

—এখন একটু এরকম হবেই। ডাক্তার একটু ঝুঁকে বললেন, সবকিছুতে অত ভয় পান কেন ?

—না, ঠিক ভয় নয়, অসিত খুব গম্ভীর হয়ে বললো, প্রথম তো—অনভিজ্ঞতা।

—তাতে নিজের শরীর খারাপ করবেন ? সেটা নিশ্চয়ই উচিত নয়।

—শরীর তো খারাপ হয় নি।

—আপনি বললেই হবে ? দেখলে তো মনে হয় যেন আপনিই বাচ্চা জন্ম দিয়ে উঠলেন। ব'লে ডাক্তার খানিকক্ষণ খুব হা হা ক'রে হাসলেন। হাসি থামালে বললেন, কই দেখি, প্রেসক্রিপশন এনেছেন ?

অসিত পকেট থেকে কাগজের টুকরোটা বের করলো। এতদিন খেয়াল করেনি—এখন দিতে গিয়ে দেখলো, রমার নামের পরে চক্রবর্তী লেখা। হাসলো।

—আমি চৌধুরী।

—কেন ? কি হয়েছে ? প্রেসক্রিপশনটা হাতে নিয়ে ডাক্তার লজ্জিত হলেন, ছি ছি। পদবীটা কেটে বললেন, চৌধুরী না ? অসিত

মাথা নাড়লো। ডাক্তার একবার অসিতের দিকে তাকালেন, লিখলেন। লিখে হাসলেন, বললেন—আশ্চর্য।

—কী?

—রমার সংগে পরিচয় ক'দিনের?

—প্রায় আড়াই বছর।

—বিয়ে?

—দু বছর।

—ওরা আগে কি ছিল জানেন?

অসিতের মনে পড়লো।

—চক্রবর্ত্তী।

ডাক্তার হাসলেন।

—আমিও চক্রবর্তী।

—আগেই তো রমাকে চিনতেন। ও কি আপনার কোন আত্মীয়া?

ডাক্তার মুখ নীচু ক'রে কি ভাবলেন। টেবিলের ওপর থেকে পেপার কাটারটা একবার নিলেন। টেবিলের কাঁচে ঠুকলেন। রেখে, রাইটিং প্যাডটা সরিয়ে রাখলেন। খবরের কাগজটাকে গুছোলেন। দরজার দিকে তাকালেন। তারপর কপালে হাত দিয়ে ধীরে ধীরে বললেন,

—রমা আমার স্ত্রী।

॥ পূর্ব-জন্ম ॥

এক

ডাক্তার চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। চোখ দেখা যায় না—চশমার কাঁচে সামনের টিউব আলো প্রতিফলিত। ঘড়িতে সাতটা বাজলো। একটা সিগারেট ধরালেন। ধোঁয়ায় মুখ প্রায় অদৃশ্য। ধোঁয়া কাটতে স্পষ্ট হলেন। বললেন,—আশ্চর্য নয়?

অসিত মুখ নীচু করে ছিল। তাকালো।

—আমার স্ত্রীর সন্তানের পিতা আপনি। একটা ধাঁধার মত। আগেকার দিন হ'লে একটা ডুয়েল-টুয়েল লড়া হ'য়ে যেত—নিদেন কোর্টঘর, কি বলেন?

ডাক্তারের অনেকক্ষণ ব্যাপী হাসি দেখে, এর মধ্যে নিশ্চয়ই তা হলে হাস্যজনক কোন কথা আছে, মনে করে, অসিতও হাসলো। কথাগুলোকে মনে আনবার চেষ্টা করলো। মনে নেই। কথার শব্দ আর সুর মিলিয়ে, তাই, শেষ কথাটাকে প্রসংগ মনে করে অসিত বললো,

—মানে, কোর্ট অবধি এগিয়ে ছিল?

—কোর্ট? ইউ মীন—ডিভোর্স? না, না ওসব কিছু হয়নি। হবার সময় পেল কোথায়? বলছি না, আইনতঃ রমা এখনও আমার স্ত্রী? আর যদি রেজেস্ট্রী করে থাকেন তো আপনারও বোধ হয়। আইন কি বলে জানি না। আপনি গল্প-টল্প লেখেন?

অসিতের মাথা নাড়ায় স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির অনুবাদ অসম্ভব দেখে ডাক্তার বললেন, ভাল নাটক হয়। ব্যাপারটা শুনুন, বলে ডাক্তার আরেকটা সিগারেট ধরালেন। টেবিলের তলায় অসিতের পা দুটো অক্লান্ত।

ডাঃ এস-পি-চক্রবর্তী বললেন :

—রমার সংগে আমার বিয়ে হয় প্রায় চোদ্দ বছর আগে—পার্টি-শনের ঠিক তিন বছর পরে, শ্রাবণে।

—বারো বছর। অসিত সংশোধন করলো।

—বারো হয় বুঝি, তা হবে। তারও বোধ হয় বিশ বছর আগে থেকে আমি ডাক্তারি করি। ঢাকার মিটফোর্ডে পড়তাম। পাশ করি নি। ফাইনালের দুদিন আগে পুলিশে ধরলো। সবাই জানতো স্বদেশী ক'রে জেলে গিয়েছি। স্বদেশী করতাম কিন্তু পুলিশে ধরেছিল অন্য এক কারণে। একটি কুমারী মুসলমান মেয়ের ওপর ডাক্তারি করতে গিয়ে মেরে ফেলেছিলাম। দোষ আমার নয়। আমার এক মুসলমান সহ-পাঠীর কাজ—আমি গিয়েছিলাম বাঁচাতে। সেই বন্ধু মাঝে পাকিস্তানে ডেপুটি মিনিষ্টার না কি যেন হয়েছিল।

ডাঃ চক্রবর্তী হাসলেন।

—যাক্। বছর খানেক বাদে জেল থেকে গ্রামে ফিরলাম। সবাই জানলো, পাশ করা স্বদেশী ডাক্তার। পশার তো বাড়বেই। বাড়লোও। কিন্তু শেষ অবধি জমলো না। দুতিন বছর পর পুলিশ ফের পেছনে লাগলো। এবার অভিযোগ খুবই গুরুতর—নরহত্যা। পালিয়ে গেলাম কুমিল্লায়। কিন্তু ফাঁকি দিতে পারলাম না। কনভিকশন হ'লো বেআইনী রিভলবার রাখার জন্য। খুনটা পুলিশ প্রমাণ করতে পারেনি।

—খুন? অসিত প্রশ্ন করলো।

—করেছিলাম। এক বিপ্লবীকে গুলি ক'রেছিলাম। তখন রক্ত গরম ছিল, স্বদেশীর নামে ব্যাভিচার সইতে পারিনি। ব্যাপারটা শুনুন। দলের এক দাদা বেশ কিছুদিন আমাদের অঞ্চলে অ্যাবস্‌কণ্ড করেছিলেন। ঢাকা থেকে নির্দেশ এলো তিনি এবার চাটগাঁ হয়ে আসামে পালাবেন, সংগে চারটে নিয়ে যাবেন। ঠিক হ'লো, আমি তার এস্‌কর্ট হ'য়ে ভৈরব অবধি গিয়ে স্টিমারে তুলে দিয়ে আসবো আর দুটো রিভলবার দিয়ে দেবো। বাকী দুটো তাকে কে দেবে, কোথায় দেবে কিছুই আমি জান-লাম না। দাদা সম্ভ্রান্ত মুসলমান সেজে স্টেশনে থাকবেন আমি ডাক্তার হয়ে যাবো। গেলাম। সে দিন আবার ভীষণ ঝড়বৃষ্টি দুপুর থেকেই।

ডাক্তারি ব্যাগট্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ছ'মাইল দূরে স্টেশন। যখন পৌঁছলাম তখন চারদিক মারাত্মক অন্ধকার। বৃষ্টি টিপটিপ ক'রে পড়ছেই, তার থেকেও বেশী হাওয়া, বিদ্যুৎ, বাজ এইসব। প্ল্যাটফরমের একধারে একটি শেড, রাজ্যের বস্তা-টস্তায় বোঝাই—তার ভেতর লুকিয়ে মুসলমান বেশী বিপ্লবী নেতার জন্য অপেক্ষা করছি। একবার কল্পনা করুন —কী ভয়ানক রোমান্টিক ব্যাপার। একেবারে পথের দাবী। একটাও লোক কোথাও নেই। উল্টোদিকের প্ল্যাটফরমে টিকিট ঘরে টিমটিমে হ্যারিকেন—দু এক জন লোকও থাকতে পারে—দেখিনি। বিদ্যুতে মাঝে মাঝেই চারদিক ঝলসে যাচ্ছে—দুড়ুম দাড়ুম বাজ পড়ছে—দাদার পাত্তা নেই। কখন ট্রেন জানিনা, আবার জিজ্ঞেস করবো যে তারও তো উপায় নেই। এক বস্তার পাহাড় থেকে আরেকটার পেছনে গেলাম—ভাল ক'রে চারদিক দেখবার জন্য। শেডটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে টিনের বেড়া—তার পরে একটা ভাঙা লেডীস ইউরিনাল। একবার বিদ্যুৎ চমকালো—সেখানে দুটো মূর্তি দেখে চমকে বস্তার গর্তে ঢুকে গেলাম। ফের আলোর অপেক্ষায় রইলাম। ক্রমাগত এত শব্দ হচ্ছিল যে ওখানে কেউ কথা বলছে কিনা কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না—বিদ্যুৎ চমকালো, একেবারে আকাশ থেকে সামনের মাঠটায় নেমে গেল যেন, এবার ভাল ক'রে দেখলাম। দেখে তো আমার চোখ ছানাবড়া। এ'ও সম্ভব ?

সম্ভবতঃ রহস্য ঘনতর হবার সুযোগ দিয়েই ডাক্তার একটু থামলেন। নাকি, অসিতের মনে হলো, কোন অস্বস্তিকর ঘটনার প্রস্তুতি ?

—চা খাবেন ?

অসিতের মাথানাড়া পূর্ববৎ দুর্বোধ্য। ডাক্তার এক নাক-খাদা দরোয়ানকে চা আনতে দিলেন। কৌতূহল নয়, শুধু তাড়াতাড়ি ছাড়া পাওয়ার বাসনাতেই অসিত মুখে ব্যগ্রতার ভাব আনলো। এবং, এতক্ষণ বসার মধ্যে অন্যমনস্কতার ভাব ছিল কিনা, মনে করার চেষ্টায় ফের অন্যমনস্ক হ'লো। ডাক্তার একটু হাসলেন। কেন, ঠিক বোঝা গেল না।

—তারপর শুনুন। ডাক্তার বলে চললেন, বিদ্যুৎতের আলোয় দেখলাম, সারা বাংলা দেশের বিপ্লবী দাদা আরেক বিপ্লবী দিদিকে

জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছেন। মহিলা বরিশালের, কয়েকবার ঢাকায় দেখেছি, ওই অবস্থাতেও কি ক'রে যেন চিনে ফেললাম। যাক, ওরা যা' করছিলেন—তা' অতি উত্তম কাজই করছিলেন। কিন্তু আমার রক্ত চ'ড়ে গেল। আরো কিছুক্ষণ বোধহয় আরো কিছু অপকম্মো করলেন—তারপর দেখলাম, শাড়ী-সমেত দাদা চট ক'রে ইউরিনালের পাশে চ'লে গেলেন। প্রথম ভাবলাম আমাকে দেখতে পেয়েছেন বোধহয়—পরে বুঝলাম, না ট্রেন আসছে। একটু পরেই দেখলাম সম্ভ্রান্ত পেশোয়ারী মুসলমান ভদ্রলোক কাশতে কাশতে শেডের ভেতর ঢুকছেন। আমি ততক্ষণে দেশ থেকে ইংরেজ এবং পাপ বিদেয় করতে বদ্ধ পরিকর। তুটো অস্ত্রের একটা রেনকোটের তলায়, আরেকটা ডাক্তারি ব্যাগে ছিল—ঠিক মনে নেই কোনটা নিয়েছিলাম, তবে বিপ্লবী দশ গজের মধ্যে আসতেই চালিয়ে দিলাম। অনভ্যস্ত হাতের গুলি তুটো কোথায় লাগলো কে জানে, বস্তাটস্তা নিয়ে দেশসেবক ধপ ক'রে পড়লেন। ট্রেনের হুইশল, আকাশের গর্জন, নিজেব উত্তেজনা ইত্যাদিতে আর্তনাদ-টার্তনাদ কিছু শুনতে পেলাম না। সোজা বেরিয়ে এসে ট্রেন থামবার আগেই চ'ড়ে বসলাম।

বিপ্লবী দিদি বোধহয় বাকী তুটো বিভলবার দিতে এসেছিলেন—তার কি হলো কিছুই জানলাম না। সেখান থেকে ভৈরব—তারপর নদী পেরিয়ে পার্বতীপুব হ'য়ে সোজা কোলকাতায় চ'লে এলাম। তারপর কুমিল্লায় গিয়ে প্র্যাকটিশ সুরু কবলাম। কয়েক মাস নিশ্চিন্ত ছিলাম। হঠাৎ একদিন পুলিশে ধ'বে নিয়ে গেল। বুঝলাম দলেরই কাজ। তিনশ তুই ধারা প্রমাণ হ'লো না—ফায়ার আর্ম্‌স্ অ্যাক্টে তু বছর জেল হয়ে গেল।

নাক-থাঁদা লোকটি চা নিয়ে এলো। কাপে চুমুক দিয়ে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন—বোরিং লাগছে না তো ?

অসিত শুধু হাসলো। ডাক্তার সুরু করলেন :

—জেল থেকে বেরিয়ে গ্রামে ফিরলাম না। বরিশাল চ'লে গেলাম—সেখানেই ছিলাম ষোলো বছর। ডাক্তারি তো ছাই—প্রতি দিন দারিদ্র্যের সংগে সংগ্রাম। স্বদেশী ডাক্তার ব'লে পরিচিত হবার চেষ্টা ক'রে দেখলাম—হারামজাদারা সুযোগ নেবার চেষ্টা করে—

টাকাকড়ি কিছুই জোটে না। তার ওপর রেজিষ্টার্ড নই—সে ভয়ও আছে, তবে পাপ ইউনিভার্সাল—এই যা ভরসা। সুরু করলাম পাপী উদ্ধার আর বেশ্যাদের ডাক্তারি। পয়সা আসলো—কিন্তু একঘরে হ'য়ে গেলাম। কোনও শালা ভদ্রলোকই আর মেশে না। অবশ্য তাতে আমার আফশোষ খুব ছিল না—কারণ, না মিশলেও, ভদ্রলোকদেরও আসতে হোত আমার কাছে। যুদ্ধের পর বিশেষ ক'রে এত দামী দামী অসুখ হতে সুরু করলো যে আমার শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর উপায় রইলো না—নইলে সব জানাজানি হ'য়ে যাবে যে। বেশ জমিয়ে বসেছিলাম—বিপদ হলো পাকিস্তান হ'য়ে। পালানোর হিড়িকে যখন সব ওলোট পালট হবার জোগার তখন বিয়ে করে বসলাম রমাকে। রমার বাবা গ্রামের মাষ্টার—খুবই দরিদ্র। দেখলাম—পাকিস্তানে আমার থাকতেই হবে। বয়স হচ্ছে—একজন অ্যাসিষ্টাণ্টও দরকার। সুতরাং বয়সে অনেক ছোট হ'লেও রমাকে দিয়েই আমার কাজ চলবে ভাল।

কিন্তু বিয়ের দিনই বুঝলাম, ভুল করেছি। আমার তখন প্রায় চল্লিশ—রমা, বোধ হয় কুড়িও হয়নি। ফলে স্বাভাবিক কারণেই প্রথম থেকেই আমাকে ও সহ্য করতে পারতো না। তাছাড়া রমা ছিল যেমন একগুঁয়ে তেমনি স্বাধীনচেতা। যে দিন বিয়ে করে রমাকে আমার বাড়ী নিয়ে এলাম—তারপর দিনই সে পালিয়ে বাপের বাড়ী চলে গেল। ঝগড়াঝাটি করে ফিরিয়ে আনলাম। কয়েকদিন বাদে ফের পালালো। এরকম আনা নেওয়া করতে করতে কাটলো ছ'মাস। এদিকে আমার একেবারেই ইনকাম নেই—দু তিন দিন না খাওয়াও চলতো—চারদিকে আতংক অনিশ্চয়তা—তার ওপর' রমার দুর্ব্যবহার। আমাকে কাছেই ঘেঁষতে দেয় না। এর মধ্যে রমার বাবা একদিন নিখোঁজ হ'য়ে গেল। তার কোন গুণধর ছাত্রই হাত পাকিয়েছে বোধ হয় মাষ্টারের ওপর। রমার বাপের বাড়ীর সবাই কোলকাতায় চলে এলো। রমাকে নিয়ে আমার হ'ল মহা মুশকিল।

চিরকাল সবাইকে আদেশ করেছি। আমার ইচ্ছেটাই চলেছে। রমার কাছে বাধা পেলাম। কিছুতেই শায়েস্তা করতে না পেরে একদিন ঠিক

করলাম ওকে মেরেই ফেলবো। একদিন তো গুণ্ডারা ধরে নিয়ে যাবেই—তার থেকে আমিই হিন্দু নারীর সতীত্ব রক্ষা করি না কেন? অভাব অনটন দুশ্চিন্তায় কেমন আনব্যালান্সড্ হয়ে গেলাম। সেই সময় কিছু রোজগারের সম্ভাবনা দেখা দিল—রমাকে খুব বোঝালাম তার কি করতে হবে। কিছুতেই সে রাজী হলো না। মারধোরও করলাম একটু। কিন্তু লাভ হ'লো না। সেই রাত্রেই রমা উধাও হ'য়ে গেল। আর খুঁজেই পেলাম না। একটু আনন্দ হলো, যাক, পালাবে কোথায়? নিশ্চয়ই পথে কেউ ধরে নিয়ে নিকে করে নিয়েছে। তাতেই যথেষ্ট শাস্তি হবে ওর।

আমার তখন এমন অবস্থা—বউ খোঁজার সময় নেই। ইচ্ছেও ছিল না। নানান ফন্দী ফিকির সুরু করলাম, ঢাকা গেলাম বহুদিন পর। পাত্তা পেলাম না। নানান ঘাটের জল খেয়ে শেষে এই কোলকাতায়। এসে সুরু করেছিলাম পাকিস্তানী পরিবেশেই—মেটেবুরুজে। সেখান থেকে এখানে আসতে অনেক নির্বোধই আমাকে সাহায্য করেছে। দেখলাম বরিশাল থেকে কোলকাতার লোকগুলো বেশী বোকা।

ডাক্তার একটু থেমে গম্ভীর হয়ে বললেন, হয়তো বোকা নয়—বেশী সিভিলাইজড্। আপনি কি বলেন?

অসিত হাসির চেষ্টা করলো। ঘড়িতে নটা বেজেছে কুড়ি মিনিট আগে। উঠতে হবে। কিন্তু সময়? কি হবে সময় দিয়ে? সবাই আরো সভ্য হবে? ডাক্তার লাভ করবেন?

অসিত উঠলো।

—আরে মশাই, এক্ষুনি যাচ্ছেন কি? বসুন, কথা আছে।

অসিত মাথা নাড়লো। ক্লান্ত অনুনয়। ডাক্তার হাসলেন।

—আচ্ছা, ওষুধগুলো নিয়ে যান।

ওষুধ গুছোতে এত সময় লাগে? অসিত ভাবলো। আর ভাবলো, ঘড়ির কাঁটা দুটো না থাকলেও কি সময় থাকতো? ওষুধের প্যাকেট করতে সময় লাগতো?

—চলি ডাক্তারবাবু। কাল কি পরশু একবার আসবো।

—কালই আসুন।

—আচ্ছা।

রাস্তায় পা দিতেই দারুণ শীত লাগলো। একটা রকে ওষুধের প্যাকেটটা রেখে ভাল ক'রে র‍্যাপার জড়ালো। ওষুধ নিলো। কিন্তু কেন, অসিত চলতে চলতে ভাবলো : চলতে হয় কেন ? সময় চলে কেন ?

দুই

—মহিলা কেমন মিস্‌টেরিয়াস।

—বিধবা কি ?

—ব্যানার্জীরও যেমন। বিধবা হ'তে যাবে কেন।

—বালবিধবা হ'লে প্রথম দু অক্ষরে অস্বাভাবিক জোর দিয়ে অজয় সেন বললো, ব্যানার্জীর কিছু সুবিধা হয় বোধহয়। এ বিষয়ে নানাবিধ খিস্তিমূলক কাহিনী শোনা আছে কিনা।

ব্যানার্জী সামান্য লাল হলো।

—ছেলেমানুষ।

—ব্যানার্জীর কথা মত বিধবা কিনা বুঝি না। তবে একটা মিস্ট্রী কিছু আছেই।

—শুনেছো চৌধুরী, আমাদের ভট্‌চায অধুনা রহস্যভেদী হ'য়ে উঠছে।

লাইব্রেরী ঘরের একপ্রান্তে ইউনিয়ন সম্পাদক অসিত চৌধুরী এক মনে একটা পোষ্টারের খসড়া তৈরী করছিল। মুখ তুলে একটু হাসলো।

আরেক প্রান্ত থেকে ক্যাটালগ তৈরীতে ব্যতিব্যস্ত সুখেন্দু ব্রহ্ম বললো, সবে তো তিন মাস এসেছেন ভদ্রমহিলা। এরই মধ্যে আপনারা এত রহস্যের খোঁজ পেলেন কি করে ?

—খোঁজ রাখতে হয়। ভট্টাচার্য একটু জোর দিয়েই বললো। বোধহয় ইংগিতটা লেগেছে।

—কমল ঘোষের কি হলো ? অসিত চৌধুরীর স্বরে অধীরতা, এখনও তো এলো না।

—ও ঘরে টেবিলটেনিস খেলছে না তো ?

একটি ছোকরা, নতুন অফিসে ঢুকেছে, উঠে দেখে এলো। ও ঘরে নেই।

—নতুন ম্যানেজারকে কেমন মনে হয়।

—পাক্কা ঘুঘু।

—মুখে মিষ্টি খুব।

—আচ্ছা মহিলা মিস না মিসেস ?

—কি চক্রবর্তী যেন।

—ও ভট্‌চায, তোমার রহস্যের নাম কি হে ?

অসিত ঘড়ি দেখলো। ভ্রূ কোঁচকালো। খসড়া শেষবারের মত সরিয়ে রাখলো। বললো, ঘোষ না এলে তো কাল মিটিং হওয়াই মুশ্‌কিল।

—ঘোষ কি আর আসবে আজ ? অজয় সেন বললো, দেখ হয় তো রহস্যকে পৌঁছে দিতে তাঁর বাড়ীই চলে গেছে।

—এত ইনসিনসিয়র ! অসিত উঠলো, তা হ'লে, ব্রহ্ম, কি বলো কাল না ক'রে পরের শনিবার মিটিং ডাকি।

—যা হয় করো, ভট্‌চায বললো, কিন্তু দেরী হয়ে যাবে না তো ?

—ততদিনে তোমাদের রহস্য অনেকটা ফিকে হবে না ? অসিত উঠে বাইরে চলে গেল।

—সম্পাদক রেগেছেন !

—কিন্তু মহিলার নামটা কি।

—ব্যানার্জী নামের জন্য ব্যস্ত কেন ?

—না, এমনি। নাম না জানলে কেমন—

—মনের কাব্যটা তেমন জমে না ?

—চৌধুরী গেল কোথায় ? সাড়ে ছ'টা তো বাজলো।

অসিত ফিরলো।

—মিটিং পরের শনিবারই হবে।

সুচরিতাসু,

গত শনিবারের মিটিংয়ে আপনার বক্তব্য সম্বন্ধে আমারও কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। আগামী এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মিটিঙে আপনার মতামত রাখবার আগে আপনার সংগে আলোচনা হওয়া দরকার। কখন সময় হবে জানাবেন।

নাম সই ক'রে অসিত একটু ইতস্ততঃ করলো। পাঠানো ঠিক হবে? কি ভাববে, কে জানে। বুদ্ধিমতীই তো মনে হয়। কাগজ ভাঁজ করে নাম লিখলো, রমা চক্রবর্তী। মিস মিসেসের ঝামেলায় না গিয়ে গোড়ায় লিখলো শ্রীমতী—শ্রীমতীর মধ্যে এই এক সুবিধা। বেয়ারার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিল চিঠিটা।

—জনার্দ্দন, এটা তিনতলায় প্রিমিয়াম সেকশনের নতুন দিদিমণিকে দিবি। যদি কিছু লিখে দেন, নিয়ে আসবি।

ডায়েরীতে লিখেছিল (কী আশ্চর্য তখন ডায়েরী রাখতো অসিত)

...এক একজন আছে যাদের আকর্ষণহীনতাই যেন আকর্ষণের যথেষ্ট কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়। ধর্মতলায় একটা রেষ্টুরেন্টে প্রায় একঘণ্টা মহিলার সংগে আলাপ হ'লো। খুব একটা রহস্যজনক কিছু মনে হলো না। তবে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখার বেশ সচেতন প্রয়াস আছে বুঝতে পারলাম। বোধ হয় এই জন্যই সবাই এই মিস্টিরিয়াস চক্রবর্তী সম্পর্কে এত কৌতূহলী।

মহিলা বেশ জোর দিয়ে নিজের মত ব্যক্ত করতে পারেন। এবং তাতে যুক্তিরও অভাব থাকে না।

কিছুদিন পরের পাতায়ঃ

...ষ্ট্রাইকের সিদ্ধান্তই নেওয়া হলো। সারা ভারত সংগ্রাম পরিষদও এই সিদ্ধান্তই নেবে। এইই সুযোগ—একবার নষ্ট হলে আর আন্দোলন করা অসম্ভব হ'য়ে পড়বে। কিন্তু মধ্যবিত্ত কেরানী কুলের সংগ্রাম—ভয় হয়, শেষ অবধি টিঁকবে তো এই উৎসাহ? মিটিঙে যা' সব উদাহরণ দেখা গেল!

...রমা চক্রবর্তী সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা ভাঙলো। ভেবেছিলাম, ষ্ট্রাইকের বিরূদ্ধে যাবে বুঝি। কিন্তু আমার সমর্থনে যখন বক্তৃতা দিচ্ছিল, মনে হচ্ছিল, একটি নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপ শিখা। (পরের চার অক্ষর কেটে অসিত, বোধহয় বুর্জোয়া মনোভাব ভেবে, লজ্জিত হাতে একটু সংগ্রামী ভাষায় লিখেছিলঃ জ্বলন্ত মশাল)

—দেখুন, আপনাদের ষ্ট্রাইকের বিরুদ্ধে আমার বলার কিছু নেই। দাবী আদায়ের শেষ অস্ত্র হিসেবে হয়তো আপনারা ঠিকই করেছেন —তবে, মিঃ চৌধুরী, আপনারা যাঁরা লীডার তাঁদের ভেবে দেখতে

বলি, প্ল্যানড্ ইকনমিতে একটা সেকশনের মাইনে হুট করে বাড়ালে কি দেশের মঙ্গল হবে ?

—আপনি ইনফ্লেশনের কথা বলছেন ? অসিত চৌধুরী নতুন জেনারেল ম্যানেজার বোস সাহেবের চোখে চোখ, রেখে বললো, এতে ইনফ্লেশন হয় না। কারণ আমরা এত কম পাই যে দু-এক টাকা বাড়লেও আমাদের টোটাল পারচেজিং পাওয়ার তাতে খুব কিছু বাড়ে না।

—কিছু তো বাড়বেই। তা ছাড়া, আপনাদের দেখাদেখি লেবার আনরেষ্টও বেড়ে যাবে। তাদেরও মাইনে বাড়াতে হয় তা হলে। একটা ভিশিয়াস সার্কল্ সৃষ্টি করছেন আপনারা।

—প্ল্যানিংএর মূল কথাই হোল—উৎপাদনের সংগে সমতা রেখে ক্রয় ক্ষমতাও বাড়াতে হয়। যে কোন একটা পিছিয়ে থাকলেই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। দেখছেন না, মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে কি ভাবে টাকা জমে উঠছে।

—ক্যাপিট্যাল যদি ইন্‌সেনটিভ না পায় তো দেশের উন্নতি হবে কি করে ? বোস সাহেব স্পষ্টতঃই ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন, তা যাক্ গে। ইক্‌নমিক্সের তর্ক—এ বিষয়ে আমাদের খুব যোগ্যতা আছে বলে মনে করি না। আসল কথা এতগুলো ছা'পোষা কেরানীকে কী বিপদের মুখে ফেলে দিচ্ছেন সেটা ভেবে দেখবেন।

—বিপদ কি কেউ সাধ ক'রে ডেকে আনে ? মৃদু স্পষ্ট স্বরে রমা চক্রবর্তী বললো, ষ্ট্রাইকের দায়িত্ব শুধু আমাদের নয় যাঁরা আমাদের বাধ্য করছেন, তাঁদেরও। আর, আর্থিক দাবী ছাড়া আরো কতগুলো দাবী আমাদের আছে। সেগুলোও আমাদের কাছে সমান ইম্পর্টেণ্ট।

—আপনি তো নতুন এসেছেন ?

রমা চক্রবর্ত্তী তাকিয়ে ছিল, উত্তর দিল না।

—যাঁরা নতুন, টেম্পোরারী তাদের বিপদ তো আরো। যাঁরা ভিক্টিমাইজড হবেন, তাঁদের বাঁচাবেন কি ক'রে ?

যদিও প্রশ্নটা অসিত চৌধুরীকে করা হলো—রমা চক্রবর্তী হাসলো, এবং উত্তর দিল, কোন রকম প্রোভোকেশন বা থ্রেটনিঙে ভয় পাবার জন্যে নতুন বা পুরনো হবার দরকার হয় না। যাঁরা ভয় পাবার, তারা

সব সময়ই ভয় পাবেন। তবে মনে হয়, এবার তেমন বিপদ আমাদের হবে না।

বোস সাহেবের চোখ যেন একবার জ্বলে উঠলো, কিন্তু শান্ত স্বরেই বললেন, শুনুন—আসল কথা হচ্ছে, সরকার এই ষ্ট্রাইক ব্যান করবে, ইল্‌লিগাল ঘোষণা করবেই। এতে পারটিসিপেট্ করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে আমার মনে হয় না—এখন আপনারা দেখুন, কি করবেন। এখনও তো একমাস সময় আছে, তাই না ?

আর কথা বাড়ানো বৃথা, সংগ্রামী কেরানী দল, ক্রোধে এবং একতার গর্বে স্ফীত হয়ে, বেরিয়ে এলো।

বেয়ারা প্লেট গুলো দিয়ে যেতেই অসিত নির্বাক হ'য়ে খেতে সুরু করলো। এতক্ষণ চুপ করে খেতে অস্বস্তি লাগছিল বোধ হয়, রমা হাসলো।

—খুব ক্ষিদে পেয়েছিল, না ?

—দারুণ।

—আরো কিছু আনতে বলি, কেমন ?

উত্তরের অপেক্ষা না করেই রমা বেয়ারাকে ডাকলো, অর্ডার দিলো।

—এ ষ্ট্রাইক সাকসেসফুল হবে না।

—কেন ?

অসিত, অর্থনৈতিক শ্রেণী বিন্যাস, মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তি, সংগ্রামের কায়দা, গত ট্রাইব্যুনালে রায়ের গলদ ইত্যাদি সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা সুরু করলো। অপর পক্ষ শুনছে কিনা, নেতাদের মতোই, খেয়াল করলো না। দেখলো না, রমার হাসি-হাসি চোখে সস্নেহ প্রশ্রয় ছিল, কিন্তু বোঝবার কোন প্রচেষ্টা ছিল না।

—সেদিন বোস সাহেবের অ্যাটিচ্যুড্ দেখলেন, যেন উনিই সব বোঝেন—আমরা কচি খোকা।

—অফিসার হলেই সব বুঝতে হয়। আর আপনিও তো বোস সাহেবের মতই বললেন।

—আরে, বলার একটা কায়দা আছে তো ? এ কি, আমরা কি ছাত্র নাকি ?

—শুধু এই রাগেই ষ্ট্রাইক করবেন ?

অন্য কেউ এমন কথা বললে, অসিত চৌধুরী আরো দু'ঘণ্টা মনোবিজ্ঞান, অর্থনীতি, শ্রেণী সংগ্রামের কৌশল সম্বন্ধে বলতো—এখন শুধু হাসলো। ছেলে মানুষের মত বললো বুক টান ক'রে—তাই মনে হয় নাকি ?

—আমার মনে হওয়া না হওয়ার মূল্য কি ?

—নেই ? বলেন কি ?

রমা চুপ করে চা খেলো।

—সেদিন যা বললেন তাতে শুধু বোস সাহেব নয় আমাদেরও অনেকে চমকে গেছে। জানেন, আমার এত গর্ব হচ্ছিল।

—কেন ? চমকে দেওয়া কথা তো আমি বললাম—আপনার গর্ব হচ্ছিল কেন ?

—হচ্ছিল। কারণ আছে। অসিত কথা পালটে বললো, বিপদ হবেই—আপনি বরং এই ঝামেলায় থাকবেন না।

—পরীক্ষা করছেন ?

—তুই যদি রোজ এত রাত ক'রে ফিরিস, তা' হলে তো—

—এখনি এত ভাবনা-চিন্তা সুরু করেছো ? আসল অনিয়ম তো এখনও বাকী আছে।

জ্যেষ্ঠ পুত্রের কথা যে মা খুব শুনলেন মনে হোল না।

—ছোট ভাই বোন গুলোকে দেখা তো ছেড়েই দিয়েছিস—অন্তত রেণুর একটা চাকরা খুঁজে দে। নয়তো পাত্র খোঁজ।

মুখে ভাত নিয়ে অসিত হাসলো।

—হাসিয়ো না, মা। বিষম লাগবে।

—এটা কি হাসির কথা হোল ?

—আচ্ছা এখন থেকে কাঁদবো। একটু থেমে অসিত বললো, অবশ্য কান্নার দিন এলো বলে। তখন সবাই মিলেই কাঁদবো'খন। শোন, ধর্মঘট-ফট হবে—ঝামেলা মিটুক তারপর সংসার ধর্ম করা যাবে।

বিরক্ত হয়ে মা উঠে গেলেন।

সেই সময়ে, কবেকার ডায়েরীতে অসিত লিখলো :

দেহ ছাড়া কোন মন আছে? কিংবা দেহাতীত কোন কামনা? সত্যকে স্বীকার করতে ভয় পাই। এবং ভয় পাই বলেই স্বীকার করতে চাই না যে পুরনো মূল্যবোধের মাথা কাটা গেছে অনেকদিন আগেই—কিন্তু এত দ্রুত আর তীক্ষ্ণ অস্ত্রে যে মাথাটা যথাস্থানেই রয়ে গেছে। কবন্ধ-টাকে জীবন্ত মেনে নিশ্চিন্ত আছি সবাই আর সত্যকে অশ্লীলতা ব'লে সান্ত্বনা পাই। জোর ধাক্কা দেওয়া দরকার। আমি ভয় পাই না—রমা বোধহয় আরও সাহসী।

—মা, আজ থেকে কয়েকদিন না এলে ভেবো না।

—কেন? কোথায় যাবি?

—কোথাও না। আজ থেকে পুলিশের ঝামেলা বাড়বে বলে মনে হচ্ছে। যদি কেউ আমার খোঁজে আসে বলে দিও, নেই।

—তোরা কি আমাকে মারতে চাস?

—আজ পেন ডাউন ষ্ট্রাইক, সর্বাত্মক ধর্মঘটের প্রস্তুতি। ঠিক পোষ্টারের ভাষায় অসিত বললো, কাউকে মারতে চাই না বলেই ত আমরা মরতে চাই।

—বোকামি করিস না।

মায়ের ধমকে অসিত হাসলো।

বেয়ারা মারফৎ রমা চিঠি পাঠিয়েছিল ঃ

কাল পেন ডাউন ষ্ট্রাইক। দেখা হবে না। শুনলাম, কাল থেকে নাকি সরকার বে-আইনী ঘোষণা করবে। সাবধানে থাকবেন। বাড়ী না গিয়ে অন্য কোথাও রাত কাটাবেন।

অন্য কোনখানেই রাত কাটালো অসিত। যাদবপুরের সরকারী ফ্ল্যাট। চারতলা বাড়ীর বস্তি। বারোটাতেও অনেক ঘরে আলো। কোথাও নীল স্তব্ধতা। কোথাও পূর্ববঙ্গীয় উচ্চকণ্ঠ।

তিনতলায় একেবারে কোণের ঘরে দরজা ধাক্কালো অসিত। সামান্য দেরী হ'লো।

—এ কি!

—একেবারে আশাতীত ?

—আশংকা ছিল।

—আশংকা ? অসিত দ্রুত বিন্যাসে এলোমেলো রমার দিকে তাকালো।

—আলোটা ?

—জ্বালাচ্ছি। রমা জানলা দুটো বন্ধ করলো। এবং দরজাটা। ঘর গভীর অন্ধকার। অসিত সিগারেট জ্বাললো। সেই আলোয় খাটে গিয়ে বসলো। কাঠিটা জ্বললো অনেকক্ষণ ধরে। রমার মুখ পাথর কিন্তু মোমের মত কোমল। সোনালী।

—আলোর দরকার আছে কি ?

কাঠিটা নিভে গেল। মেঝেতে পড়ে কিছুক্ষণ লাল বিন্দু হ'য়ে জ্বললো। দুজনে দেখলো।

—কিন্তু বিছানা করতে হবে যে।

—দরকার কি ?

—সারাদিন খুব খাটুনি গেছে না ?

—হ্যাঁ ক্লান্ত। দারুণ ক্লান্ত। কিন্তু আলো থাক।

সমস্ত ক্লান্তি, সমস্ত অন্ধকার, সমস্ত ভয়, সমস্ত সংকোচ এক আশ্চর্য বেদনায় সংহত হলো।

—রমা।

—হুঁ।

—পুলিশের তাড়নায় এক মহাদেশ আবিষ্কার ক'রে ফেললাম।

—কাব্য ?

—মাঝে মাঝে খুব ইচ্ছে করে।

—মাঝে মাঝে ?

দুজনের হাসি দুজনে অনুভব করলো। আর দুজনেই বোধহয় অনুভব করলো, এক আশ্চর্য বেদনা আনন্দের মতো তীব্র হ'লো। গভীর হলো।

—রমা।

—বলো।

—রমা।

—পাগল।

সমস্ত মন, সমস্ত দেহ, সমস্ত চেতনা সময় হারালো, আচ্ছন্ন হলো, খাটের বাচালতায় লজ্জিত হলো।

প্রভূত উত্তেজনা। ষ্ট্রাইকের আগের দিন। কিন্তু ষ্ট্রাইক বলে নয়। বোম্বে থেকে খবর এসেছে, ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হোল।

—ব্রহ্ম, তোমাকে বলিনি, অসিত কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বললো, বিশ্বাসঘাতকতা আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে।

—কিন্তু ব্যাপারটা কি?

বিমর্ষ অজয় সেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো।

—আর ব্যাপার। কিন্তু কাল থেকে তিন দিন শ্বশুরবাড়ী থাকবো খবর পাঠিয়েছি যে।

—কিন্তু ব্যাপার এখানেই মিটলো না। এখন ধীরে ধীরে ক'জন শহীদ হয় দেখ।

—প্রতিদিন দু'একজন ক'রে এয়ারকণ্ডিশণ্ড ঘরে ডাক পড়বে, একটা বেলপাতা ধরিয়ে বলবে, চড়ে খাওগে যাও।

—প্রেসিডেন্ট এবার মাঝে মাঝেই খুব প্লীজ্‌ড হবেন।

—মায়ের দয়ার মত।

—ধুত্তোর। ভিজে বিড়িটা ফেলে দিয়ে ভট্‌চায উঠলো, চৌধুরী তোমাদের নেতারা তো আচ্ছা বাঁশ দিলো, একটা কিছু ব্যবস্থা করো।

—কি ব্যবস্থা?

—তা কি জানি! কিন্তু এতগুলো লোক কি ইঁদুরের মত পড়ে মার খাবে?

—কিন্তু উপায় নেই।

ব্যানার্জি যেন দ্রষ্টা হ'য়ে উঠেছে। আর অসিত নিরুত্তর।

—একটা কিছু ব্যবস্থা করো।

রমার মুখের দিকে তাকিয়ে অসিত বোঝবার চেষ্টা করলো। কিসের?

—বাড়ীর সব ফ্ল্যাটেই তো কানাকানি শুরু হ'য়েছে।

—লোকের কথাকে কে ভয় করে।

—ভয় আমিও করি না। তবে একসংগে থাকতে তো হয়। সবাই এমনভাবে তাকায়।

—সে তোমার অপরাধ বোধ। অহেতুক।

—সে নয় বুঝলাম, এড়িয়ে থাকা যাবে কি ?

—কি ব্যবস্থা করতে হবে ?

—রেজিষ্ট্রেশন।

—বাড়ীতে বলি ?

—নিশ্চয়ই।

—তোমরা সবাই বড় হয়েছ, তোমাদের বাধা দেওয়ার কথা ওঠেনা। মা বললো, ভেবে দেখ সমাজে বাস করতে হয় আমাদের। এ রকম একটা কাজ—

—সমাজটমাজ বাদ দাও। অসিত বললো, তুমি জানো আমি ওসব মানি না।

—তুমি না মানতে পারো, আর সবাইকে মানতে হয়। রেণুর বয়স হয়েছে বিশুটা তো একেবারেই গোল্লায় গেছে। তার ওপর তোমার উদাহরণ—

—শোন মা, উপদেশ দিও না। তোমার আসল বক্তব্যটা কি বলো। মত আছে কি ?

—না।

মা কাঁদলো না। স্তব্ধ হয়ে রইল। রেণু কথা বললো না। তাকালো না। বিশু বাড়ীর বাইরে বাইরেই রইল। অসিত বাড়ী থেকে বার হলো।

—তুমি তো আমার কথা ভাল ক'রে কিছুই জানো না। এত বড় দায়িত্ব নিলে ?

—জানলে নিতাম না ?

—কি করে বলবো ?

—জেনে কি হবে ? তুমি তুমিই। এ পরিচয়ই চিরকাল থাক।

রমা নিরুত্তর। অসিতের বলতে ইচ্ছে হ'লো, তুমি আমাকে জীবনের একেবারে মাঝখানে নিয়ে এসেছো রমা, তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু কিছু না বলে তাকালো। রমা বললো, তোমার হাতটা দাও।

অসিত হাত বাড়িয়ে দিল।

ডায়েরীতে লিখেছিল : ষ্ট্রাইক সফল হলো না। রমা জীবনে এলো। বাড়ী ছাড়লাম। পথ শেষ হলো, না শুরু হলো? কে জানে।

এরপর অসিত আর কোনদিন ডায়েরী লেখেনি। অবসর পায়নি।

তিন

চলতে চলতে চলাটাই যখন মুখ্য হয়ে ওঠে, তখন বড় ক্লান্ত লাগে। পথে উৎসাহ থাকে না, শংকা থাকে। তাই নানান যুক্তিতে থেমে থাকা-কেই বিশ্রামের প্রয়োজন বলে মানতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু পারা যায় না। কারণ সময়ের যে ক্লান্তি নেই।

তিনদিন তিন রাত্রি। অসিত বাড়ীতে ফিরেছে অসময়, নারায়ণ বাবুর স্ত্রীর ঢাকা দেওয়া ভাত খেয়েছে। বেরিয়ে গেছে, ঘুরেছে, আবার ফিরেছে। কিন্তু রমার সংগে দেখা করতে পারেনি, ডাক্তারের সংগে দেখা করতে পারেনি। কিন্তু দেখা করতেই হবে।

রাত্রে ঘরে গেল অসিত। দরজা ঠেলে ঢুকতে সংকোচ হলেও ঢুকলো। রমা পেছন ফিরে স্পিরিট ষ্টোভে কি যেন গরম করছিল অসিত ঢুকতে ফিরে তাকাল, হাসলো।

—কোথায় থাকো সারাদিন? আয়নায় দেখেছ চেহারাটা কি হয়েছে?

অসিত দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। কি করছো?

—জল গরম করছি।

—গায়ে গরম কিছু দাওনি কেন?

—ঠাণ্ডা তো লাগছে না। বসো বিছানায়। দেখতো বাচ্চাটা ঘুমোচ্ছে না জেগে আছে?

অসিত বিছানায় বসলো। বাচ্চাটা চোখ বুঁজে, ঘুমোচ্ছে বোধ হয়। কী ছোট্ট ছোট্ট নাক মুখ। গা শিরশির করে।

—ছেলে, না মেয়ে ?

রমা হেসে উঠলো।

—তুমি কী।

—শুনেছিলাম। ঠিক মনে নেই। ছেলে, না ?

—কাউকে বলো না। এক সপ্তাহ পরে বাপ জিজ্ঞাসা করছে ছেলে না মেয়ে ?

দু জনেই হাসলো। রমাকে কেমন শীর্ণ অপরিচিত লাগছে। চুল রুক্ষ, দু বিনুনি করা—ঠিক হাসপাতালের মত। ঘরের গন্ধটাও তাই অস্বস্তি লাগে।

—ঘুমোচ্ছে ?

—কি জানি, চোখ তো বোজা।

ঘুমোচ্ছে। দাঁড়াও, ওকে খাইয়ে নি।

—কি ?

—ওই যে তুমি কি সব নিয়ে এসেছো।

—ঘুম থেকে তুলে খাওয়াবে ?

—তাই খাওযাতে হয়।

বাঃ অনেক কিছু জেনে গেছ তো।

রমা পাশে বসলো। সাবধানে বাচ্চাটাকে কোলে নিল। গোলাপী ঠোঁট কান্নার মত হলো। তাকালো। ছোট্ট চোখ। চা-চামচে মুখে লাগাতে হাঁ করলো। টুকটুকে লাল।

অসিত হাসলো। রমা হাসলো।

—কেমন ইঁদুর বাচ্চার মতো লাগে।

—ধ্যাৎ, কি যে বলো—।

—আচ্ছা রমা।

রমা মুখ তুললো। বিস্মিত।

—না থাক। বাচ্চাটাকে শুইয়ে নাও।

রমা চুপ করে খাওয়ালো। বাচ্চাকে ভাল করে জড়ালো। শোয়াল। জিজ্ঞাসা করলো, খেয়েছো ?

অসিত মাথা নাড়লো। কিছুক্ষণ চুপচাপ।

—কি বলবে বলছিলে ?

—ওষুধগুলো আছে ?

—আছে। অসিতের মনে হোল, রমার মুখ যেন একটু শক্ত হলো।

—ডাক্তারের সংঙ্গে তোমার সম্পর্কের কথা আগে বলো নি কেন ?

রমা তাকালো। এই তিনদিন সারাক্ষণ এই প্রশ্নটাই করবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিল অসিত, এখন, প্রশ্ন করে মনে হলো, যেন খুব হঠাৎ বলা হয়ে গেল। এবং উত্তর না পাওয়াই স্বস্তিজনক মনে হ'লো যেন। রমা প্রশ্নটা এবং প্রশ্নের উত্তরটা ভুলে যেতে পারে না। মেঝেতে অদৃশ্য অক্ষরে রমার নাম লিখতে লিখতে অসিত এ কথাটাই বলতে যাচ্ছিল। রমা বললো, তুমি তো জানতে চাওনি কোন দিন।

—আজও চাই না। অসিত উঠলো।

রমা কেমন যেন ভীত হলো, কিন্তু তুমি যে কিছুটা জেনেছ। সবটা শোনো।

অসিত হাসলো। আজ থাক। রাত হলো, শুয়ে পড়ো।

অনেক কিছু জানতে না চাইলেও জানতে হয়। কারণ জানাটাই ঘটনা হয়ে ওঠে। ঘটনার ভেতর দিয়ে সময় চলে। সেই সময়ে জীবন কাটাতে হয়। জীবনকে এড়ানো কঠিন, জীবনের তীক্ষ্ণতাকে, কঠিনতর। ডাক্তার আগেই যেতে বলেছিল, কি কথা আছে, অসিত যায় নি— কিন্তু রমার ঘরে ঢুকতেই হলো পরদিন। এখানে বাধ্যতা কর্ত্তব্য বোধের। তাই নিরুপায় অসিত হালকা চালে বললো। ওষুধ-টষুধ তো দরকার নেই। তাই না ?

—দরকার আছে। বোসো

অসিত বসলো।

—ডাক্তারের কাছ থেকে জেনেছ—আমার কথা শুনবে না ?

—তুমি বুঝতে পারছো না —পুরনো কথা জেনে কি হবে বলো ?

—শুনতে হবে তোমাকে। রমা মুখ নীচু ক'রে কি যেন ভাবলো। পরে বললো, আমি একজনের বিয়ে করা বউ, পালিয়ে গিয়েছি, কোথায় কি ক'রে কাটিয়েছি কেউ জানে না, তোমাকে ভুলিয়ে বাড়ী থেকে বার করেছি, কিছু না জানিয়ে বিয়ে করেছি, এ সব জঘন্য অপরাধ নয় ?

—পাগলের মত কি যা তা বলছো ?

—পাগলের মত ? রমা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললো, কিন্তু এর একটাও তো মিথ্যে নয়। মিথ্যে কি ?

—সত্য মিথ্যার বিচার কি না করলেই নয় ?

—তুমি শুনতে আপত্তি করো না। শোনো। রমা হঠাৎ অনুনয়ে করুণ হয়ে উঠলো, যে মিথ্যা থেকে, মৃত্যু থেকে পালিয়ে গিয়েছি, পালিয়ে বেড়িয়েছি এতদিন—সেই মিথ্যা চিরকাল তাড়া ক'রে বেড়াবে এ যে ভাবতেও পারি না। আরো একটু চুপ থেকে রমা বললো, স্পষ্ট হতে দাও।

—বলো।

রমা বললো :

বিয়ে যখন হয় তখন আমার বয়স ষোল আর ঐ লোকটার বয়স চল্লিশ। সবে পাকিস্থান হয়েছে—চারিদিকে বিশৃংখলা, আতংক। পাত্রের বয়স হ'লেও, বাবা হয়তো ভেবেছিল, ডাক্তার যখন পয়সা তো নিশ্চয়ই আছে। তার ওপর প্রতিষ্ঠার জোরে বরিশাল শহরে থাকা হয় তো অসম্ভব হবে না। তা ছাড়া কিছুই দাবী নেই। আমাকে প্রায় বিলিয়ে দিতে হচ্ছে বলে সবাই খুব কান্নাকাটি করলো। আমিই কাঁদলাম না।

বিয়ের দিন রাত্রে, স্থূল একরাশ মাংসের তাল যখন হারিকেন উস্কে খাটের এসে বসলো, পুরানো খাটটা যেন আঁত্‌কে উঠলো। মদ খাওয়া লোক আগে কোনদিন দেখি নি, ভয়ে একেবারে সিঁটিয়ে ছিলাম—তার ওপর এত বড় লোকটা, যাকে বয়সের গুণে বাবা কাকার মত শ্রদ্ধা-ভয় করতে পারি, সে যখন আমার গায়ে হাত দিয়ে কি যেন বলতে এল, আমি একেবারে চীৎকার করে ছুটে বাইরে চলে এলাম। সে রাত্রে আর গেলামই না। সবাই বকলো, তবু যেতে পারলাম না। কেবলি একটা অনুচিত চিন্তা মনে আসছিল, যেন কোন কাকা—কিম্বা যেন বাবাই, ছি ছি।

বাসি বিয়ের দিন, তার পরদিন, ভয়ে সমস্ত চিন্তা যেন আমার কেমন গুলিয়ে যেতে লাগলো—এই বুঝি গুণ্ডারা বাড়ীতে আগুন লাগাবে, এই বুঝি আমাকে আগুনে ঠেলে ফেলে দেওয়া হবে। একা থাকলে, নিজেকে কেমন ভয় ভয় লাগত। আমি যেন খুব অপরাধ করেছি, খুব, খুব। আমি যেন মরে যাবো। শ্বশুর বাড়ী যাবার আগে বাবার সংগে কথা

বলতে পারলাম না—দারুণ ঘৃণা করতে ইচ্ছে গেল। বাবা যেন খুব অপরাধ করেছে—সেই অপরাধের কোন ক্ষমা নেই। আমার কাছে ক্ষমা নেই।

বললে হয়তো বিশ্বাস করবে না, নিজেকে যেমন ভয় করতে স্থরু করলাম—তেমনি সমস্ত বয়স্ক লোকদেরই এক রকম লাগত। কেমন পশুর মতো, যাদের ভয় করতে হয়, ঘৃণা করতে হয়। ফুলশয্যার রাত্রে লোকটা, ডাক্তার তো, আমার অবস্থা দেখেই হয়তো, ঘুমের না কিসের এক ওষুধ, বিষ নয় নিশ্চয়ই, খেতে দিল। কিন্তু তখন আমি নিজেকে ভয় করি—আর সবাইকে সন্দেহ করি। ঐ লোকটার বলার ভংগী যেন বাবার মতো—আমি কাপটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। কাপ ভাঙার শব্দের সংগে মোটা গলায় ও চেঁচিয়ে বললো, ন্যাকামী বাপের বাড়ীতে করবে। এখানে ওসব চলবে না। ব'লে, বাইরে চলে গেল।

প্রতি মূহূর্তে আমার সন্দেহে, আতংকে, যন্ত্রণায় মৃত্যুর মত মনে হতো। নিজেকে মনে হতো অশুচি। কিন্তু মৃত্যুর কথা ভাবলে ভয় করতো। ও তো একাই থাকতো। কিন্তু বাড়ীতে কতগুলো বুড়িটুড়ি কারা সব থাকতো। আমি তাদের সংগে শুতাম। তারা তো যাচ্ছেতাই সব বলতো। কে শোনে।

আমার তখন লজ্জা, ভয়, সংকোচ কোনটাই ছিল না। কেমন বেপরোয়া, মরিয়া হয়ে উঠছিলাম ক্রমে। সব ব্যাপারটাই কেমন যেন ভুতুড়ে, দম আটকানো স্বপ্নের মত মনে হত। হয়তো একদিন স্থইসাইড করেই বসতাম—কিন্তু তা না ক'রে বাপের বাড়ী পালিয়ে এলাম। বরিশাল শহর থেকে আমাদের গ্রাম বেশী দূরে নয়—তখন দাংগার সময়। কিন্তু আমার ওসব ভয় ছিল না।

ঝগড়াঝাটি করে নিয়ে যেত—কিম্বা অনেক সময় বকুনি দিয়ে বাবাই পাঠিয়ে দিত। কিন্তু বারবার চলে আসতাম। এর মধ্যে একদিন, তখন ও বাড়ীর বুড়ীগুলো কোথায় চলে গেছে, আমি একা—তোমাদের ডাক্তার পাগলের মত হয়ে আমার গায়ে হাত তুলতে ছুটে এসেছিল। আমিও একটা ধারালো দা নিয়ে তৈরী ছিলাম। আমার চেহারা দেখেই হয়তো ভয় পেয়ে গেল। বললো, যে করুণায় তোমাকে

বিয়ে করেছি—তার ছিটে ফোঁটাও এখন আর নেই। যদি দরকার হয় তো কেটে কুচি কুচি করে ফেলে দেবো। কেউ জানতেও পারবে না। ওর ভয় দেখানোতে মোটেই ভয় পাইনি—কিন্তু এরপর যাচ্ছেতাই ভাবে যে কথাগুলো বললো তা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

আমরা তিন বোন একসংগে মানুষ হয়েছি—আমি আর দুজন জ্যাঠতুতো দিদি। যে সবচেয়ে বড়, মেজদি বলতাম, দারুণ সাহসী আর তেজী ছিল। ছোটবেলা থেকেই স্বদেশী করতো—জেলেও গিয়েছে কয়েকবার। তাকে যেমন শ্রদ্ধা করতাম, তেমনি ভালবাসতাম। মেজদি যাঁকে ভালবাসতো তিনিও একজন বিপ্লবী ছিলেন। সবাই জানতো তাঁর সংগেই মেজদির বিয়ে হবে। হঠাৎ একদিন শোনা গেল তিনি নাকি ঢাকার এক ষ্টেশনে গুলি খেয়ে মারা গেছেন। কে মেরেছে কেউ জানে না। চারদিকে মেজদির নামে বদনাম ছড়ালো। গুজব রটে মেজদিই নাকি মেরেছে।

তখন আমি নেহাত ছোট- কিছু বুঝতাম না। শুধু দেখতাম, মেজদি কেমন শুকিয়ে কালো হয়ে যেতে সুরু করলো। প্রায় দু বছর কারো সংগে কথা বলেনি—অন্যেরাও মেজদিকে এড়িয়ে চলতো। সে যুগে কোন কোন সাহসী মেয়ে ইংরেজকে ভয় করতো না বটে, কিন্তু নোংরামি সহ্য করার শক্তি তখনও কারোর হয় নি। একদিন রাত্রে খবর এলো পরদিন ভোরে নাকি পুলিশ বাড়ী সার্চ করবে। ভোরের অন্ধকারে পুলিশ এলো—মেজদির জন্যই এসেছিল, কিন্তু তাকে পেলো না। মেজদি তখন বাইরে একটা কাঁঠাল গাছে ঝুলছে। সেই প্রথম মৃত্যুকে দেখলাম—কী, ভয়ানক কী কুৎসিত। যাকে সবচেয়ে সুন্দর মনে হত, সবচেয়ে যাকে ভালবাসতাম—তাকেই সবচেয়ে বীভৎস ভাবে দেখলাম। তোমার ডাক্তার বললো, সে-ই নাকি বিপ্লবীকে খুন করেছিল আর মেজদির জন্য খুব দুঃখ হতো বলেই আমাকে দয়া ক'রে বিয়ে করেছিল। তারপর প্রতি মুহূর্তে মেজদির ভূত যেন তাড়া করে বেড়াতো আমাকে।

পাকিস্তান হবার পর বহুদিনই অনাহারে কাটাতে হয়েছে। দারিদ্র্যকে ভয় করি, ঘৃণা করি—তখন নিজেকে ভয় করতাম আরো। বাবা নিখোঁজ হল। আমি আর থাকতে পারলাম না। বিয়ের পর ছ মাস

নরকে ছিলাম– তারপর, গ্রাম সম্পর্কে এক কাকা কোলকাতায় আসবে শুনে তাদের সংগে চলে এলাম।

এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ বলে রমা হাঁপিয়ে উঠলো। একটু হেসে চুপ ক'রে রইল। বাইরে এখনো ম্লান আলো টলটল করছে আকাশে। ঘর অন্ধকার। অসিত কোন কথা বললো না, শুধু সেই অন্ধকার স্তব্ধতাকে মনে মনে অনুভব করলো।

বাচ্চাটা ঘুম থেকে উঠেছে অনেকক্ষণ। কেঁদে উঠলো। কী ক্ষীণ আর সরু গলা। অসিত ভাবলো, হঠাৎ মনে হলো : জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানেও হয়তো এমন ক্ষীণ একটা কান্না আছে। শোনা যায়, কিন্তু সব সময় মনে থাকে না।

রমা বাচ্চাটাকে কোলে নিল, ব্লাউজের বোতাম খুললো। বাচ্চাটা চুপ।

—তারপর ?

অসিতের প্রশ্নে রমা তাকালো।

—কাকাদের সংগে আসবার জন্যে কতগুলো মিথ্যে কথা বলেছিলাম। কিন্তু সেই মিথ্যে ধরা পড়তে বেশীদিন লাগলো না। তখন স্বভাবতই তাঁরা আমাকে সন্দেহ করতে সুরু করলেন। ক্যাম্পে থাকা, তার ওপর বিবাহিত, প্রায় অনাত্মীয় আমি—তাঁদের কাছে বিরাট একটা দায় হয়ে উঠলাম। ভয় করতো, তারা না আবার বরিশালে খবর পাঠায়। অনেক চেষ্টা চরিত্র করে রেফিউজি হিসাবে একটা নার্সিং ট্রেনিঙের ব্যবস্থা করলাম। আমার এক নতুন জন্ম হলো, তাঁরাও বাঁচলেন।

—তুমি ট্রেণ্ড ? নার্স ছিলে জানতাম, কিন্তু—

—জানতে না। দু' বছর ট্রেনিঙে ছিলাম— তিন বছর হাসপাতালে কাজ করেছি। এর মধ্যে ম্যাট্রিক পাশ করেছি, আই এ পাশ করেছি, টাইপ শিখেছি। তারপর অফিস। তারও পরে তুমি। নতুন জন্ম নয় ?

অসিত কিছু বললো না। কিছু বলার নেই। এক সপ্তাহে এত শুনতে হয়েছে, এত চমকাতে হয়েছে, এত ভাবতে হয়েছে যে, ভাবনাকে, ভাবনার অনুভূতির রঙকে, সে যেন আর চিনতেই পারে না। বোঝার চেষ্টাও করে না। বাচ্চাটা কি কাঁদলো ? অসিতের মনে হলো, ক্ষীণ মৃদু কান্নার, শব্দ কানে বাজছে। কিন্তু কোথায় ? রমার বুকে মুখ

দিয়ে এখনও তো মগ্ন। উষ্ণতার সুখ কি এখনই বুঝতে পারে শিশুরা ? যে উষ্ণতায় নিশ্চিন্ত নির্ভরতার আশ্বাস থাকে ?

হঠাৎ অসিতের খুব শীত লাগলো।—বাচ্চাটা কি কাঁদলো ?

—কই, না তো। রমা বাচ্চার মুখের দিকে তাকালো। ভাল ক'রে কম্বল জড়ালো। নিজের গায়ে আঁচল টানলো।

—কম্বলটা তো নারায়ণবাবুদের ?

—হ্যাঁ।

—ফেরৎ চাইবে না তো ?

—মনে হয় না। তবে আমাদের একটা কেনা উচিত তাড়াতাড়ি।

—উচিত তো নিশ্চয়ই, কিন্তু—

—তুমি চাকরীর চেষ্টা করছো ?

—এতদিন তো কাগজই দেখবার সুযোগ পাইনি।

—কেন, এত কি কাজ ?

রমার প্রশ্নকে কৈফিয়ৎ দাবী মনে করে অসিত বিরক্ত হ'লো। নিজের জন্য রমা এমন কথা কোনদিন বলেনি। বাচ্চার জন্য এত পরিবর্তন ? কিন্তু খুব কি অসংগত প্রশ্ন ? কাজ মোটেই ছিল না, যখন মনে হলো অসিতের ছিল না—তাই পার্কে ব'সে রাস্তায় ঘুরে দেরীতে বাড়ী ফিরে, সময়কে অবজ্ঞা ক'রে, ভেবেছে, সময় চলছে না, তখন অসিত লজ্জিত হ'লো। নিজের কাছে সে লজ্জা ঢাকতে, তাও অজানা রইলো না, তাই আরো লজ্জা পেয়ে, অসিত বললো, ব্যস্ত ছিলাম। আজ থেকে কাগজ দেখব।

—দেখো : নইলে তো—কথা অসম্পূর্ণ রেখে রমা বাচ্চাটাকে শোয়াল।

—এটার কি নাম রাখলে ?

—এখনই কি নাম ?

—রাখতে হবে না ?

—তুমিই বলো।

—তুমি বলো।

—তোমার নামের সংগে মিলিয়ে 'অজিত' ?

—দূর, পুরনো। বরং তোমার নামের সংগে মিলিয়ে রাখো কমা।

দুজনে হেসে উঠলো।

—ফুলষ্টপ নয় ?

—কখনো নয়। আরো বিশিষ্ট করবার হলে করো উর্ধ্ব´কমা। রমা তার ছেলে উর্ধ্ব´ কমা।

—ধ্যাৎ। সত্যি একটা ভাল নাম বেছে রেখো।

—রাখবো। অসিত উঠলো।

মাথার কাছ থেকে ওষুধের শিশি আর প্রেসক্রপশন নিল অসিত। রমা দেখলো, কিছু বললো না। অসিত বেরিয়ে গেল। রমা আলোয়ান জড়ালো।

চার

একজন স্নাতক ছ'মাস বেকার, চাকরী করতে করতে অসিত একথা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতো না। মনে হতো, আন্তরিকতা থাকলে এবং বেকার জীবন বিলাসিতায় পরিণত না হ'লে চাকরী পাওয়া কঠিন নয়। মাইনে কম হতে পারে—সেটাকে কানা মামা ব'লে স্বীকার ক'রে আরো ভাল'র জন্য চেষ্টা করা যায়। অন্তত তাতে দম ফেলবার অবকাশ তো মেলে। ছ'মাস বেকার থেকে, ছ'মাস চাকরী খুঁজে অসিত আজ আর তেমন ক'রে ভাবতে পারছে না। চাকরী আছে, কিন্তু কোনটাই অসিতের জন্য নয়। কারা যে সে সব পায় কে জানে। গত ছ'মাসে সমস্ত খাম, রেজিষ্ট্রেশন আর পাসপোর্ট ফটোর পয়সা জুড়লে বাচ্চাটার দশটা কম্বল হ'য়ে যাবে নিশ্চয়ই। কিন্তু হাস্যকর ব্যাপার হ'লো, সে পয়সায় চাকরী হয় নি, বাচ্চার কম্বলও তাই হবে না।

রাষ্ট্রপতির খুসীতে অসিত বেকার, জ্বর আরও কিছুদিন চললে নিরাকার হতে হবে। ডাক্তার খানার দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে অসিত ঠিক করলো : সবাইকে চাকরীর কথা বলতে হবে। কোত্থেকে কি হয় বলা যায় নাতো।

—আসুন। কি খবর ?

—ভাল। অসিত বসতে বসতে বললো।

—আর সব ভাল হয়তো, কিন্তু আপনাকে তো ভাল মনে হচ্ছে না। জ্বর হয়েছে নাকি ?

—না।

—তবে ?

—চাকরী নেই। খুঁজতে টুজতে হয় সারাদিন। অসিত আর অপেক্ষা না ক'রে প্রথমেই সুরু করবে ঠিক করলো, দিন না একটা। আপনার তো অনেক জানা শোনা আছে।

—চাকরী ? ডাক্তার অনেকক্ষণ অসিতের চোখে চোখ রেখে চুপ ক'রে রইলেন। আজ একটু যেন গম্ভীর, আর চিন্তিত। হাসলেন, আমি চাকরী দেবার মালিক ?

—আপনার অনেক পেশেণ্ট আছেন, যাঁরা দিতে পারেন।

—পেশেণ্ট নয়, পেশেণ্টের স্বামী বা বন্ধু হয়তো অনেক আছেন তাঁরা পারেন, তাঁদের তো আমার পক্ষে বলা মুশকিল।

—কেন ? মুশকিল কেন ?

—তাঁরা তো সব চোরের মত লুকিয়ে আসেন, টাকা দিয়েই চলে যান। বলবার তো অবকাশই নেই।

রোগিনীর অভিভাবকদের এ রকম রহস্যজনক আচরণ কেন, জানতে ইচ্ছে করলো অসিতের। অনুমানেই যা বোঝা যায়, তা প্রশ্ন ক'রে স্পষ্ট করতে গেলে ডাক্তার কি ভাববেন মনে করে অসিত চুপ করেই রইল।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, তা' আপনার এখন চলছে কি করে ? খুবই অসুবিধার মধ্যে আছেন।

অসিত হাল্কা চালেই সুরু করেছিল, কিন্তু ডাক্তারের গম্ভীর স্বরে আন্তরিকতার আভাস পেয়ে বিচলিত হলো। সমস্ত আবরণ উড়ে যেতে চাইলো।

—অসুবিধা ? কথাটা গুরুত্বে কম, আরো ওজনে ভারী প্রতিশব্দ খুঁজে না পেয়ে অসিত করুণভাবে হেসে সেটা পুষিয়ে নিয়ে বললো, ঘাড়ের ওপর বিরাট দায়িত্ব—কিন্তু একটা পয়সাও রোজগার নেই। এতদিন কোন রকমে চলেছে, এখন থেকে তো তা'ও চলবে না। পোষ্টাফিসে যা ছিল তা' আর কতদিন থাকে ? ছ'মাস তো চললো।

—এখন চালাচ্ছেন কি ক'রে ?

—নারায়ণবাবুর দয়াতে চলছে।

—সামন্ত ? সে ভাল লোক, ওর কাছ থেকে নিতে লজ্জা করবেন না।

—লজ্জা ক'রেই বা কি করছি। তবে অন্যের একটা সংসার তিনিই বা কত টানবেন। আর আমার তা' আশা করাই তো অনুচিত। তা ছাড়া আমার মা ভাইবোনের সংসারও তো আছে। বলতে বলতে অসিত নিজের মনেই আতংকিত হ'য়ে উঠলো। দায়িত্ব বিরাট—একথা সে জানে, কিন্তু কাউকে কোন দিন বলতে হয় নি, তাই বিরাট কথাটা যে কত বিরাট, সেটা অনুভব করতে পারতো না, ডাক্তারকে ব'লতে গিয়ে আজ বুঝতে পারলো যেন দায়িত্বটা শুধু কথার কথা নয়—একটা বাস্তব অবস্থা। এবং ভয়ংকর।

ডাক্তার হয়তো বুঝলেন অসিতের অবস্থা, বললেন, বিপদে সাহায্য নিতে লজ্জা করবেন না। তা ছাড়া আপনিও তো প্রতি মুহূর্তেই বঞ্চিত হচ্ছেন, অপরকে একটু আধটু বঞ্চিত করবেন না কেন ? আদর্শ, কল্পনা নীতিবোধ ওগুলো ভরা পেটের জন্য রেখে অবস্থা অনুযায়ী কাজ করুন, নইলে তো মরবেন।

—সেই জন্যই তো চাকরী চাইছি।

—চেষ্টা করবো। কিন্তু সেটা তো অনিশ্চিত, তার আগে আপনাকে একটা প্রস্তাব দেবো। ভাল করে ভেবে দেখবেন।

—কি প্রস্তাব ?

—বলছি। কিন্তু আপনি যে রকম আনপ্র্যাক্টিকাল, আপনাকে বলতে ভয় হয়। কি ভাবে নেবেন, কে জানে।

পরিচিত সব ডাক্তারেরা, ডাক্তারের মত সব লোকেরাই, অসিতকে বাস্তববুদ্ধিরহিত ব'লে কেমন যেন আনন্দ পান। আগে অসিত রাগ করতো, প্রতিবাদ করতো, এখন প্রায় বিশ্বাস করতে সুরু করেছে।

—প্র্যাকটিকাল হ'তে যে জোর দরকার, সেটা যে নেই।

—যাক। প্রথমে ডাক্তারি করি—সব কেমন আছে বলুন।

—বাচ্চাটার পেটটা একটু খারাপ শুনলাম।

—একটা ওষুধ দিচ্ছি, ডাক্তার প্যাডে লিখে অসিতকে দিয়ে বললেন, কিনে নেবেন। আমার কাছে নেই। খুব ভাল প্রিপারেশন, দু'

কৌটা করে চারবার খাওয়াবেন। তার পর, আপনি কেমন আছেন ?

—আমি ? আমি তো ভালই।

—ভাল নেই। রাত্রে ঘুম হয় ? পেট কি বলে ?

অসিত শুধু হাসলো। উত্তর দিল না। ডাক্তার ড্রয়ার থেকে একটা বড় ওষুধের শিশি বের করলেন।

—আমাকে স্যাম্পল দিয়ে গেছে। খুব ভাল টনিক—খাওয়ার আগে হু'চামচ খাবেন। রমাও খেতে পারে।

হঠাৎ সীতা ঢুকলো। একট উত্তেজিত। অসিতকে দেখে একটু থমকে দাঁড়ালো, তারপর বললো, ডাক্তারবাবু আপনি একটু ওপরে যান। এক পেশেণ্ট—

—কে ?

—সুনন্দা ঘোষ।

—জ্ঞান ফিরেছে ?

সীতা মাথা নাড়লো। ডাক্তার উঠে যেতে যেতে বললেন, অসিতবাবু, একটু বসুন। যাবেন না। এক্ষুনি আসছি।

ডাক্তার বেরিয়ে গেলে সীতা একটু ইতস্তত করে একটা চেয়ারে বসলো। বললো, হ্যাঃ। এক্ষুনি আসছি। আসতে পারবেন কিনা।

—কেন ?

—ঐ পেশেণ্টটা বোধ হয় মরবে।

—কেন, কি হয়েছে ?

—কি আবার হবে, সীতা অত্যন্ত তিক্ত ভাবে বললো, যে রোগ হলে মেয়েরা এখানে মরতে আসে।

—কি রোগ ?

—অত শুনে কি করবেন ? সীতা মুখের ভাব পালটে মিষ্টি ক'রে হাসলো, অনেক দিন পরে এলেন—ভাল আছেন ?

অসিত মুখ নীচু করলো। মেয়েটার কাণ্ডজ্ঞান বোধ হয় একটু কম। কাকে কি বলতে হয়, কে কি ভাববে—অত দুশ্চিন্তা নেই। এ এক হিসেবে মন্দ নয়।

—কি ভাবছেন অত ? ভাল আছেন কিনা ভেবে দেখেছেন ?

—তা বটে। ভাল আছি কিনা, সেটা সত্যি বিচার করেই বলতে হয় আমার।

—ভাল মন্দের ভেদটুকুও ঘুচে গেছে নাকি ? মহাপুরুষ।

অসিত ভাল ক'রে দেখলো সীতাকে। রঙ যত ফর্সা মনে হয়, তত নয়, বরং ময়লা। একটু উজ্জ্বল। চোখ দুটো ছোটই, কিন্তু তীক্ষ্ণ, চঞ্চল। কপাল চওড়া, চুল টেনে বাঁধার জন্যে আরও চওড়া মনে হয়। আর সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিমিত। সবশুদ্ধ চেহারাটা মন্দ নয়। কোন মেয়েকে এমন খুঁটিয়ে অসিত কোনদিন দেখে নি। মনে মনে হাসলো।

—কী দেখছেন অমন করে ?

—দেখছি, পূর্ব পরিচয়ের কোন সূত্র খুঁজে পাই কিনা।

—আগে পরিচয় না থাকলে বুঝি মেয়েদের সংগে কথা বলতে নেই।

—না, তা নয়। অসিত বললো, আপনি আমাকে চেনেন কিনা, তাই অস্বস্তি লাগে।

—আপনাকে আমি রমাদির সংগে বিয়ে হবার আগে থেকেই চিনি। রমাদির যাদবপুরের বাড়ীতে একদিন দেখেছিলাম। পরেও অবশ্য দু' জনকে দেখেছি রাস্তা ঘাটে।

—কিন্তু আমার তো একেবারে মনে নেই। রমার সংগে পরিচয় হলো কি ক'রে ?

—রমাদি যে হাসপাতালে নার্স ছিলেন সেখানে আমি ট্রেনিং-এ ছিলাম।

—ও ? আপনিও নার্স ?

—নয়তো এখানে ডাক্তারি করতে আসি নাকি ?

—এখানে চাকরী করেন ?

—চাকরী বলতে পারেন, আবার পার্টনারও বলতে পারেন।

—মানে ?

—সব আপনাকে বুঝতে হবে বুঝি ?

মেয়েটির এই এক বদ রোগ, অসিত ভাবলো, সব কথা অর্ধেক বলে একটা রহস্য সৃষ্টির অপচেষ্টা। ছেলেমানুষ আর কি।

—সব আর কোথায় ? কিছুই তো বুঝতে পারি না আপনার। শুধু আপনাকে কেন, কাউকেই বুঝতে পারি না। কত চেষ্টা করি।

—কেন, আপনি কি গোয়েন্দা নাকি ?

—গোয়েন্দারা যেখানে শেষ করে, আমি সেখান থেকে বুঝতে চেষ্টা করি।

—চেষ্টা করেন ? ছাই, মানুষকে কি বোঝা যায় ? আপনি পারেন ?

—পারি না। তাই তো দুঃখ।

—ভাগ্যিস পারেন না। পারলে তো মরে যেতেন, নয়তো বুদ্ধদেব হতেন। এত নীচতা, ইতরামি, এত যন্ত্রণা, শঠতা জেনে ফেললে তো আপনাকে রাঁচী যেতে হবে। ওসব অপচেষ্টা করবেন না।

এ কথাগুলোকে আগে অসিত ভাবতো, বিলাসিতা—নয়তো বুর্জোয়া অবক্ষয়। এখন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না, এবং করে না বলেই, ভুল কোথায় হচ্ছে মন দিয়ে খুঁজতে গিয়ে শোনে। মেয়েটি এমন তীব্রভাবে বলতে শিখলো কি ক'রে ? একি শুধু কথার কথা ? নাকি, আন্তরিক অনুভব ? অসিত স্থির দৃষ্টিতে সীতাকে দেখলো। সীতার চাহনিতে কি সন্দেহ, অবিশ্বাস, যন্ত্রণা ? অসিত বললো, কিন্তু আমাকে তো চেনেন বলে দাবী করেছিলেন।

—শুধু নামটা জানি, চেহারাটা চিনি, মানুষটাকে চিনি না। কেউই চেনে না। আপনি আমাকে চেনেন না, যদি সত্যি চিনতে চেষ্টা করেন—দেখবেন কী কুশ্রীতা, কী হিংস্র যন্ত্রণা, কী ছলনা আছে আমার মধ্যে। আমি জানি কতকটা, কিছুটা নিজেও জানি না লুকিয়ে রাখি, সবাই লুকিয়ে রাখে, সবার মতই নিজেকে শোভন সহনীয় ক'রে প্রকাশ করি। আপনি যদি কিছুটাও জানতে পারেন, শিউরে উঠবেন। জানার চেষ্টা তো দূরের কথা, কাছেও ঘেষবেন না। অবশ্য একান্ত বাধ্য না হলে কেউই কারোর কাছে ঘেষতে চায় না। আমার টাকার দরকার, তাই বিভিন্ন জনের সংগে হেসে কথা কইতে হয়। নইলে কে কার কড়ি ধারে বলুন ?

এক সংগে অনেকগুলো কথা বলে সীতা সম্ভবতঃ হাঁপিয়ে উঠলো। অসিত কিছু শুনেছে, কিছুটা শুনতেই পায়নি। ভাবছিল, এ কি স্বগতোক্তি ? আত্মকথন ? না, নিজেকে দিয়ে সবাইকে বিচার ? ইচ্ছে হলো

জিজ্ঞাসা করে, এত বিক্ষোভ, এত বেদনা কিসের ? না করে, অসিত হাসলো।

—যাক, দর্শন না শুনিয়ে কাজের কথা বলুন।

মেয়েটি বুদ্ধিমতী। সংগে সংগে মুখের ভাব বদলে হাসলো।

—কাজের কথা ?

—একটা ট্যুইশনের কথা বলেছিলেন।

—হ্যাঃ এতদিন আপনার জন্যে টিউশানি থাকে কি না।

—নেই ? আমার যে বড় দরকার।

ঠাট্টার মত করে বলবার চেষ্টা করলেও অসিতের স্বরে হয়তো অসহায় ভাবটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। সীতা খানিকক্ষণ তাকিয়ে কি যেন ভাবলো।

—দরকার। আরো একটু চুপ থেকে সীতা বললো, কাল একবার দেখা হবে ?

—কখন ?

—বেলা তিনটেয়।

—এই ডাক্তারখানা খোলা থাকবে ?

—এখানে নয়। এই রাস্তার মোড়ে।

—হবে। তিনটে তো ?

সীতা মাথা নাড়লো। উঠে ডাক্তারের ড্রয়ার থেকে কি সব জিনিষ নিজের ব্যাগে ভরলো। পেছন ফিরেই বললো, মানুষ চিনবেন ? চিনুন গে যান—ওপরেই আছে, সুনন্দা ঘোষ। দারুণ গরীব, কুমারী মেয়ে বাচ্চা হ'তে এসেছে। বছর খানেক আগেও একবার এসেছিল, তখন এনেছিল একটা গুণ্ডা মত লোক। এবার যে এনেছে, খুব বড় লোক মনে হয়, সদাশয় ব্যক্তি, খুব চিন্তা মেয়েটির জন্য, কান্নাকাটি করে। টাকায় কার্পণ্য নেই—কিন্তু মেয়েটি বাঁচবে না। যান না, তাকে চিনুন, কেন সে এক বছরে দু'বার এই বে-আইনী জায়গায় আসে—জিজ্ঞাসা করুন গে। সীতা ফিরলো। চোখ দুটো আশ্চর্য কোমল। হেসে বললো, সুনন্দা আমার ছোট বেলার বন্ধু। মরবে, বোধহয় আজই মরবে। কিন্তু কি জন্যে বলুন তো ?

স্তব্ধ অসিত তাকিয়ে রইল।

—কাল আসবেন তো ? সীতা খুব অনুনয় ক'রে বললো, ভুলবেন না।

—প্রয়োজন তো আমার। ভুলবো কেন?

—আমি তাড়াতাড়ি চলে যাই। ডাক্তার বাবু এলেই আটকে দেবেন আবার। জিজ্ঞাসা করলে বলবেন, অনেকক্ষণ আগেই চ'লে গিয়েছি, কেমন? উত্তরের অপেক্ষা না করেই সীতা পথে নামলো। এত তাড়ার কারণ অসিত বুঝলো, সিঁড়িতে ডাক্তারের জুতোর শব্দ শোনা যাচ্ছে।

ডাক্তার এলেন। খুব গম্ভীর। চুপ ক'রে বসে রইলেন। অনেকক্ষণ পরে বললেন—বুঝলেন অসিতবাবু, বিপদ যখন আসে তখন একেবারে দল বেঁধে আসে।

শেক্সপীয়রের লাইনটা মনে পড়লো অসিতের। বললো না, অশোভন মনে ক'রে কিছু জিজ্ঞাসাও করলো না। হঠাৎ যেন ডাক্তার সজাগ হলেন। রাত হচ্ছে। এবার যাবেন তো?

—যেতে হবে। অসিত নড়েচড়ে বসলো।

—বলছিলাম কি, ডাক্তার ভূমিকা না ক'রে বললো, আপনার এখন যা অবস্থা, তাতে রমা আর বাচ্চার ভার বহন করতে আপনি পারবেন না। এই অনিশ্চিত অবস্থা থেকে মুক্তি যদি চান তবে রমাকে আর বাচ্চাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। রমা এখনও আমার স্ত্রী—এবং সেটা স্বীকার করতে বিন্দুমাত্র আমার সংস্কারে আটকাবে না। শুধু আপনার উপকার করার জন্য বলছি না, আমারও কাজ আছে। রমাকে দিয়ে যা হবে—সীতাকে দিয়ে তা হওয়া সম্ভব নয়। যাই হোক আমার দিক আপনার দেখবার দরকার নেই—আপনি নিজের কথাটা বিচার করুন। ভাবুন—রমাকে বুঝিয়ে বলুন—তারপর আমাকে জানাবেন। আমার মনে হয়, সেটাই সবচেয়ে ভাল হবে। ্ইলে বাচ্চাকে বাঁচাতে পারবেন না।

অসিত শুনলো। গায়ে আলোয়ান জড়ালো। বললো, ভেবে দেখবো! রমাকেও বলবো। আজ চলি।

আর না দাঁড়িয়ে অসিত বাইরে এলো। এসে মনে হলো, ওষুধের শিশিটা আনা হয় নি।

জীবনের অনেক অনালোকিত অংশ আছে যা আদর্শের আলোয় হয়তো ব্যাখ্যা করা যায়, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করা যায়—কিন্তু সহৃদয় অনুভব অসম্ভব। অভিজ্ঞতাব তীব্র রুক্ষ আলোয় উদ্ভাসিত হ'লে সেই অংশকে মনে হয় বিচ্ছিন্ন, সাময়িক, আকস্মিক। মনে হয়, এই তো মাত্র কয়েকটা পদক্ষেপ দ্রুত পেরিয়ে গেলেই সামনে বাঁক—তারপরে ফের সুস্থ স্বাভাবিকতা। যেন বাঁধা বৃত্তপথের বাইরে এ এক স্বপ্ন, যদিও অস্বস্তিকর, ভুলে গেলেই তৃপ্তি। সময়কে অবজ্ঞায় বিস্মৃত হওয়া চলে, অন্তত সেই তীক্ষ্ণ দাবদাহ দগ্ধ করে না বোধহয় মনকে, কিন্তু হিসেব নিকেশেব বেলা নিজেব কাছে জবাবদিহি করতেই হয়। সময় বড় নির্মম।

অসিত চৌধুরী সময়কে অস্বীকার করতে চেয়েছে, বেদনাকে জীবন বিচ্ছিন্ন ভেবে অবজ্ঞা করেছে, শীতের বেলায় গরম জামা গায়ে না দেবার কৈশোরিক সাহসিকতায় কার্যকারণের ফরমুলায় চেতনা ভরিয়েছে—কিন্তু সময় যখন এলো, দেখলো, খুব হতাশ হয়েই দেখলো, মুঠি তার একেবারেই আলগা। কাঁপা হাতে জীবনেব শংকিত আঁকাবাঁকা রেখা পড়ে—শিল্প হয় না। অসিত জীবনশিল্পী হ'তে চেয়েছে—শুধু জানতো না, সময়-জীবন-যন্ত্রণা সমার্থবোধক। তাই জীবনে জীবন যোগ করতে গিয়ে সে শুধুই জীবনকে খণ্ড করেছে, ক্ষুদ্র করেছে, বোধ হয়, প্রায় ব্যর্থ করে তুলতে চলেছে। কারণ যন্ত্রণাকে সে ভয় করতো—যন্ত্রণাকে এড়াতে ভয়ের কাছে মাথা নুইয়েছে। ফলে সেই নত মস্তকে যন্ত্রণাই চেপে বসেছে। অজস্র কল্পনায়, আদর্শে, আশাবাদিতায় আর কুলোচ্ছে না। নিজেকে অসিত করুণা করতে শিখেছে আজকাল। হাসি পায়, হাসে। রমা আর নিজের মধ্যেকার অনিশ্চয়তার চৌকাঠকে বিদ্রূপ করে, অবহেলা করে, তুচ্ছ করে—কিন্তু আর অস্বীকার করে না।

দেখা করার কথা তিনটেয়. পাছে দেবী হয়, অসিত আড়াইটা বাজতেই বেরুলো। বাস যে সাত মিনিটেই যথাস্থানে পৌঁছে দেবে, এমন আশংকা ছিল না। তাই প্রায় কুড়ি মিনিট রাস্তায় প্রতীক্ষার অস্বস্তি ভোগ করতে হবে ভেবে অসিত সব কিছুর ওপর রাগ করলো।

সীতার কথা. এই দেখা করার রোমান্স রমাকে বলার ইচ্ছে ছিল—কিন্তু বলতে গেলে ডাক্তারের কথাও বলতে হবে ভয়ে ওঘরে আর পা দেয় নি অসিত। কিন্তু বলতেই হবে. নইলে নিজের কাছেই নিজেকে ভীত মনে হবে।

কিন্তু সংক্ষেপে বলতে গেলে, অসিত রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ভাবলো: আমি ভীত। আতঙ্কিত। 'অ্যাণ্ড ইন শর্ট—আই ওয়াজ আফ্রেড। আই ওয়াজ আফ্রেড। আফ্রেড। জামার ভেতরে সোয়েটার. দারুণ কুট কুট করছে। পুরনো হলে কি পশম ছালার মত হ'য়ে যায়? ভেতরটা একেবারে ঘেমে গেছে। এবং ঠিক সেই সময় বাস থেকে সীতা নামলো। সেও ঘেমে গেছে। চিবুকে, কপালে, ঠোঁটে উষ্ণতার বিন্দু।

—কতক্ষণ দাঁড়িয়ে?

—আমার ঘড়ি নেই। কটা বাজে

সীতা ঘড়ি দেখলো। আমার মিনিট পাঁচেক মাত্র লেট হয়েছে।

—তা হ'লে আমি পঁচিশ মিনিট দাঁড়িয়ে।

সীতা সময়ের যোগ-বিয়োগের মধ্যে না গিয়ে হাসলো। মুখ মুছলো। বললো, কোথায় যাবেন?

—কোথায় মানে? সে তো আপনি জানেন।

—চলুন, কোন পার্কে গিয়ে বসি।

—এই দুপুরে, রাস্তার ধারে, পার্কে? অসিত মেয়েটির সাহস আর নির্বুদ্ধিতা দেখে বিস্ময়ে প্রায় হতবাক। একেবারে বাক্যহারা হবার আগে বললো, মাথা খারাপ? পুলিশে ধরবে তো।

—ইঃ, ধরলেই হোল। সীতা বললো, কিন্তু যাবেন কোথায় তা'হলে?

রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে এই বয়সেও অসিতের সংকোচ হয়। কে কোথায় দেখে ফেলবে কে জানে একটু বিরক্ত হয়েই বলতে হ'লো, জানি না।

—তা হ'লে চলুন কোন রেষ্টুরেণ্টে যাই।

সমস্যার যেন সম্পূর্ণ সমাধান ক'রে সীতা চলতে সুরু করলো। দুপুরবেলা রেস্তোরাঁর কেবিন যে সমস্যা বাড়িয়ে তোলে—এ কথা কে তাকে বোঝাবে? কিন্তু ডেকেছে কেন? জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হ'লেও মনোমত একটা রেস্তোরাঁ পাওয়া, কেবিনে বসা এবং পর্দা টানা অবধি অপেক্ষা করলো অসিত।

—আসতে বলেছিলেন কেন?

—বাঃ, প্রয়োজন তো আপনার।

—আমার প্রয়োজন তো ট্যুইশন, জোগার করেছেন?

—একটা হাতে আছে। আরেকটু বিকেল হোক, নিয়ে যাবো।

—তার জন্যে এত আগে থেকে?

—কেন, আপনার কি খুব অস্বস্তি লাগছে?

—লাগছে। কোন কাজের কারণ না জানা অবধি আমার দারুণ অস্বস্তি লাগে।

—কারণ? আপনার সংগে কথা বলতে ভাল লাগে, তাই।

এবার অসিত সত্যি বাক্যহারা। চুপ ক'রে দেখলো। বোকার মত ভোঁতা উত্তরে অনেক বুদ্ধিমান সত্য কথা বলে। সীতার কথাটা তামাসা, না সত্যি?

বেয়ারাকে দুটো চায়ের কথা বললো সীতা। টোষ্টের কথা বলতে গেলে অসিত বারণ করলো। ফাঁকা পকেটে পরের পয়সায় চা চলে, কিন্তু টোষ্ট একটু বেশী। সীতা ফিস ফিস ক'রে বললো, শুধু চায়ে কি বেশীক্ষণ বসতে দেবে?

—ফ্যান বন্ধ করলেই না হয় আবার চা নেওয়া যাবে।

—সেই ভাল। সীতা হাসলো। ওপরে তাকালো। কাগজ জড়ানো ফ্যানের মুণ্ডু আছে, ব্লেড নেই। অসিতও হাসলো এবার।

—সীতা কথা বলতে পারে অনর্গল। মিনিট পনের কুড়ির মধ্যেই অসিত জেনে গেল ওর মা নেই বাবা নেই, কেউ নেই। ও একা হষ্টেলে থাকে। ষোলো সতের থেকেই কাজ করতে হচ্ছে। এখন বয়স বাইশ। তেইশও হতে পারে। ম্যাট্রিক পাশ, আই এ পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। ইচ্ছে

আছে আরও পড়বার, কিন্তু জানে, হয়ে উঠবে না কোনদিন। ডাক্তারের কাছে কাজ করছে আজ দেড় বছর। সে এই ক্লিনিকের পার্টনার এই অর্থে যে বহু রোগী তার মারফত আসে। কিন্তু তবু ডাক্তার সন্তুষ্ট নন।

সন্তুষ্ট নন? অসিতের মনে পড়লো ডাক্তারের কথা। রমা যা পারবে সীতাকে দিয়ে তা হয় না। মানে? অসিত জিজ্ঞাসা করলো আপনি কি ট্রেণ্ড নার্স নন?

—না। ট্রেনিং শেষ হবার কয়েক মাস আগে আমাকেই রোগিনী হ'তে হ'য়েছিল। ভর্তি হয়েছিলাম এই ক্লিনিকেই।

—তাই না কি? কেন, কি অসুখ?

—আপনার ঐ এক বদরোগ। সব জানতে চান কেন? সীতা অসিতের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো। আর হঠাৎ কেমন চুপ করে গেল।

অপর পক্ষ যে চুপ এটা অসিত প্রথমে খেয়াল করে নি। রমার সংগে ডাক্তারের সম্পর্কের কথা বললো রমার কথা বললো, নিজের কথা বললো, বাচ্চাটার কথা বললো। সীতা শুধু মাঝে মাঝে, কী আশ্চর্য! তাই নাকি? জানতাম না তো! তাই বুঝি, করে গেল? শেষে, অসিত যখন ডাক্তারের প্রস্তাবের কথা বললো, তখন সীতা একটু গম্ভীর হলো।

—তা কি ঠিক করলেন?

—ঠিক করার আবার আছে কি?

—মানে?

—মানে, যেমন সব কিছু আছে তেমনিই থাকবে।

—ডাক্তারবাবু যদি কেস করেন? করতে পারেন তো?

—তা পারেন। অসিত একটু ভেবে বললো, তবে সাক্ষী প্রমাণ তাঁকে আনতে হবে। আজ আর তা' পারেন কি? বলতে বলতে অসিতের মনে হলো—আদালত, উকিল, আইন, সাক্ষী, প্রমাণ, কথাগুলো কেমন অশ্লীল। কেস করাই যথেষ্ট, জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন ওঠে কি? সীতাও সে কথাই বললো—ডাক্তারবাবু এমনিতে ভাল লোক, কিন্তু ক্ষেপে গেলে যা তা করতে পারেন। আর, মকদ্দমা করাটাই তো খারাপ।

—আপনি কি বলেন?

—আমার মতে, কোন রকম সংস্কার না রাখাই ভাল। সুস্থ শরীরে

ভাল মত খেয়ে পড়ে থাকতে না পারলে স্নেহ-মমতা, প্রেম-ট্রেম সব উবে যায়। তাই না?

—তা' যায়। অসিত যেন সীতার সিদ্ধান্ত কিছুটা অনুমান করতে পারলো।

—যেখানে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার প্রশ্নটাই বড়, সেখানে উচিত-অনুচিতের বিচার অবস্থা অনুযায়ী হওয়াই দরকার। সীতার স্বরে বিন্দুমাত্র চাপল্য নেই—খুবই ভেবে বললো, আপনার দায়িত্ব বিরাট। নিজের সংসার, তার ওপর আপনার বাড়ী আছে। কোনটাই এখন পারছেন না—অন্তত একটা দায়িত্ব ভাল ক'রে পালন করুন। রমাদিকে সুস্থ করা, বাচ্চাটাকে মানুষ করা অনেক টাকার ব্যাপার। আপনার তা' ক্ষমতা নেই। অন্তত এখন নেই। কিন্তু ওদের ভাল ভাবে থাকতে দিতে পারেন। আমি বলি, ওদের ডাক্তারের কাছেই পাঠিয়ে দিন।

সীতা কি বলবে অসিত আগেই বুঝতে পারছিল—কিন্তু স্পষ্ট কথা শুনে সমস্ত রক্ত যেন মাথায় উঠে এলো। চীৎকার না করেই বললো, ছিঃ আপনি একথা বলতে পারলেন? একটু থেমে অসিত উঠলো, চলুন বার হই।

ব্যাগ গুছিয়ে নিতে নিতে মুখ নীচু ক'রে সীতা বললো, ভুল বুঝবেন না। আমি আপনার আর্থিক অবস্থার কথাই—

—বুঝেছি।

এরই মধ্যে আকাশ গাঢ় হ'য়ে এসেছে। রাস্তার ওপরে সংক্ষিপ্ত পশ্চিম আকাশে একটানা ধূসর রিক্ততা। প্রায় পত্রহীন কৃষ্ণচূড়া, রেনট্রি, বকুলগাছগুলো অসুস্থ চেহারায় অপ্রস্তুত হ'য়ে রয়েছে। বাতাসে হাল্কা ধোঁয়া। চোখ জ্বালা করে। একবার আড়চোখে অসিতের দিকে তাকিয়ে সীতা কুন্ঠিত হলো।

—আপনি রাগ করছেন।

—রাগ নয়, আমি ভাবতে পারি না।

সীতা কথা বললো না। নির্জন রাস্তাটা লেকের দিকে গেছে। কোন কথা না ব'লে, কেউ কারোর সম্মতি না নিয়ে, দুজনে সেই পথ ধরলো। এত উত্তেজিত মনে হচ্ছে কেন? অসিত ভাবলোঃ অপ্রত্যাশিত ব'লে? কি প্রত্যাশা? সবাই অসিতের মনের ভাব

বুঝতে পারুক, ডাক্তার বিনা পয়সায়, বিনা বাক্যব্যয়ে ওষুধ দিয়ে যাক, চিকিৎসা করুক, আর অসিত জীবনের শিল্প রচনার নামে শুধু কল্পনায়, চিন্তায়, স্থবির হ'য়ে থাকুক? সবার কাছে এই কি প্রত্যাশা যে বাচ্চাটাকে মানুষ করার জন্য সমস্ত পৃথিবী উপকরণ জুগিয়ে যাবে আর মগ্ন অসিত জীবন গড়বে? সত্যি অসিত আর ভাবতে পারছে না। কারণ, পকেটে এখনও ডাক্তারের দেওয়া বাচ্চার ওষুধের প্রেসক্রিপশনখানা রয়ে গেছে।

—ডাক্তারবাবু বোধ হয় নিজের অবস্থা সম্পর্কে আমাকে সচেতন করবার জন্যই একটা ওষুধ বাইরে থেকে কিনতে বলেছেন।

—কি ওষুধ?

অসিত কাগজখানা দিল। রাস্তার আলোয় সীতা দেখলো।

—ওষুধটা সত্যি আমাদের ডাক্তারখানায় নেই। কাগজখানা ফেরৎ দিয়ে সীতা বললো, খুব ভাল টনিক। কিনে নিন। টাকা পাঁচেক দাম বোধ হয়।

—কিনে নিন। অত্যন্ত তিক্ত স্বরে অসিত বললো, সব ডাক্তার খানার লোকেরাই আর রমার ভূতপূর্ব স্বামী নয়।

—ভয়ানক রেগে গেছেন। একটা কথা বলবো?

—কি কথা?

—আমার কাছে টাকা আছে। এখন কিনে নিন। পরে দেবেন আমাকে।

হ্যাঁ-না কিছু না ব'লে অসিত বললো, আপনার ট্যুইশন কোন দিকে?

—এ দিকেই। একটু এগিয়ে চলুন।

হঠাৎ রাগ প্রকাশ ক'রে ফেলার জন্য অসিত লজ্জিত। তাই চুপ। সীতা, অসিত বুঝল, একটু ঘাবড়ে গেছে। স্তব্ধতার অস্বস্তি কাটাবার জন্যে অসিত জিজ্ঞাসা করলো, ছাত্র না ছাত্রী? কোন ক্লাশ?

—ছাত্রী। আমি ভদ্রলোক সম্পর্কে কিছুটা জানি, কিন্তু আপনার ছাত্রী বা টাকাকড়ি সম্পর্কে কিছুই জানি না এখনও।

—ভদ্রলোকের মেয়ে, না বোন?

—পালিতা কন্যা। এই ভদ্রলোকের এক ইতিহাস আছে। সীতা

কিছুক্ষণ কথা বলবার খোরাক পেয়ে বাঁচলো, নাম কি ব্যানার্জী যেন। খুব বড়লোক। বেশী বয়েস নয়। স্ত্রী চিরকাল রুগ্ন—কি রোগ কে জানে। বাচ্চা কাচ্চা নেই—একটি মেয়েকে পালে। তার জন্যই টিউটর দরকার। আরেকটা ব্যাপার—সীতা গলার স্বর একটু নামিয়ে বললো, এঁর এক নর্মসহচরী আছে। সে কুমারী—পেটের দায়ে এপথে এসেছে। তার বাচ্চা হবে। ভদ্রলোক খুবই আনন্দিত। মেয়েটিকে নাকি বিয়ে করবেন বলে কথা দিয়েছেন। সেই আনন্দের ফলেই কিন্তু আপনার এই চাকরীর সম্ভাবনা।

সীতা হাসলো। অসিতও। বললো, সে যে আনন্দেই হোক, এখন আমার আনন্দের কারণ ঘটলেই তো বাঁচি।

—এসে গিয়েছি। ঐ হলদে বাড়ীটা।

সীতা বেল টিপলো। চাকর এলো। ব্যানার্জী আছেন—এই সংবাদ দিয়ে বসবার ঘরে বসালো। সাজানো গোছানো ঘর, আর দশটা বড়লোক ঘরের মতই। সোফাগুলো খুব নরম, বসতে সংকোচ হয়। ব্যানার্জী সাহেব ঢুকলেন। সাহেবের মতো মোটেই নয়। পাজামা-গেঞ্জী পরা, ওপরে আলোয়ান জড়ানো। বসতে বসতে বললেন, আপনার ফোন পেয়ে একটু আগেই অফিস থেকে চলে এসেছি।

—এঁর কথাই বলেছিলাম। সীতা পরিচয় করিয়ে দিলো, অসিত চৌধুরী।

—নমস্কার।

—নমস্কার।

তারপর ভদ্রভাবে মাষ্টারের যা' যা' জানা সম্ভব সবই জানলেন। ছাত্রীর কথা বললেন। নিজের মেয়ে বলেই পরিচয় দিলেন। ক্লাশ নাইনে পড়ে। অংকে কাঁচা, ইংরেজীটা ভাল ক'রে তৈরী করা দরকার, হাতের লেখাটাও ভাল নয় আর বাংলাটা, যদিও মাতৃভাষা, একটু নজর দিলে ভাল হয়। শেষে বললেন, বোঝেন তো, কাজে এত ব্যস্ত থাকি যে এদিকে দৃষ্টি দেবারই সময় পাই না। স্ত্রী অসুস্থ হ'লেও মাঝে মাঝে দেখেন, কিন্তু সবসময় পড়ার চাপ না থাকলে কি চলে ?

সব সময় পড়ার চাপ রাখার যৌক্তিকতা অসিত মনে মনে স্বীকার

করলো। কিন্তু সপ্তাহে ক'দিন এসে, এবং কত টাকার বিনিময়ে, এই চাপ সৃষ্টি করতে হবে জানতে না পেরে বড়ই অস্বস্তি অনুভব করলো। কি আশ্চর্য, টাকার কথা বলেনা কেন ?

—তা হ'লে আপনার ছাত্রীকে ডাকি ?

—নিশ্চয়ই।

ছাত্রীকে ডাকবার জন্য চাকরকে ডাকতে ব্যানার্জী সাহেব উঠলেন। ডাকতে হ'লো না। চাকর নিজে থেকে এসে হাজির হলো। সংগে আরেকটি লোক, যাকে দেখে অসিত, এবং সীতাও, বিস্মিত হলো। ডাক্তার খানার সেই খাঁদা দরোয়ানও তাদের দেখে কম বিস্মিত নয়। সীতা বললো, বাহাদুর, কি ব্যাপার ?

দরোয়ান কোন কথা না বলে একটা খাম ব্যানার্জী সাহেবের হাতে দিলো। তিনি প্রথম উলটে পালটে দেখলেন, ক্লিনিকের নামটা পড়লেন, ভ্রূ কোঁচকালেন, শেষে খাম ছিড়ে চিঠিটা খুললেন। হাতে-লেখা চিঠি পড়তে পড়তে উঠে দাঁড়ালেন।

—সে কি ! মারা গেছে ? অসম্ভব। ব্যানার্জী ফের বসলেন। দরোয়ানের দিকে স্থির দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, তা' এত পরে কেন ?

দরোয়ান কি যেন বললো। সীতা বললো, কী হয়েছে ?

ব্যানার্জী সাহেব চিঠিখানা দিলেন। পড়ে সীতার মুখ কেমন বিবর্ণ হয়ে গেল। ব্যানার্জী সাহেব বললেন, ঠিক আছে। গিয়ে দেখছি। পরে সীতাকে বললেন, আপনিও যাবেন তো ? আমি এক্ষুনি আসছি, আপনি বসুন। একটু এগিয়ে গিয়ে অসিতকে বললেন, আমি অত্যন্ত দুঃখিত, মিষ্টার চৌধুরী। আজ আর কিছু কথা বলতে পারছি না। পরশু রোববার—আপনি সেদিন সকালে আসুন, কেমন ?

ব্যানার্জী বেরিয়ে গেলেন। সীতা বললো, বাহাদুর তুমি যাও। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।

বাহাদুর চলে গেল। সীতা কেমন ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছে যেন। ব্যাগ থেকে দশ টাকার নোট বের করে বললো,—অসিতবাবু, আপনার সংগে আর যেতে পারছি না। ওষুধটা কিনে নেবেন।

শেষ অবধি কি হবে, কিছু বুঝতে পারছি না। পরে দেখা হবে তো ?

—কেন হবে না ? অসিত টাকাটা নিলো।

—কিছু বলা যায় না। সীতা ম্লান হাসলো।

—ব্যাপার কি ?

—সুনন্দা ঘোষ, যার কথা একটু আগে বলছিলাম, মারা গেছে।

—সুনন্দা ? কাল রাত্রে ডাক্তারখানায়—

—হ্যাঁ সেই, মেয়েটি। আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু। সীতা একটু চুপ ক'রে বললো, বোধ হয় আমিই মেরে ফেললাম। আচ্ছা আপনি যান।

ব্যানার্জী সাহেব আসছেন বোধ হয়। পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। অসিত বেরিয়ে গেল।

সবই যেন অদ্ভুত, দ্রুত, বেখাপ্পা। গত কয়েকদিনের ঘটনাই কেমন আকস্মিকতার চমকে ভরা। সবটাকে ভাগ্য, অদৃষ্ট, নিয়তি বলে স্বীকার করে নেওয়া যায়, কিংবা বলিষ্ঠভাবে সমস্ত বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়ানো যায়। কিন্তু যেহেতু জীবন অন্য-নিয়ন্ত্রিত ঘটনা-নির্ভর, তাই 'টু টেক আর্মস এগেনষ্ট এ সী অব ট্রবলস্', মানে অজস্র মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। কিন্তু মুশকিল, তারা যে বলিষ্ঠতর। নইলে, সুনন্দা বলে মেয়েটি এই সময়ে মরবে কেন ? ব্যানার্জী লোকটি ভাল, পয়সা দিয়ে কেনা মেয়ের মৃত্যুতে তাই বিচলিত হয়। এতে তার হৃদয়ের মহত্ব প্রকাশ পেলো বটে, কিন্তু তাতে অসিতের কোনো লাভ হলো না। ট্যুইশনটা বোধ হয় হাত ছাড়াই হয়ে গেল। সমস্ত ব্যাপারই যদি এমনি করে ফসকে যায়, অসিত কি করতে পারে ?

অতএব, অসিত খুব নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্ত নিল : যাই ঘটুক, নির্বাক হয়ে দেখে যেতে হবে। নান্যঃপন্থাঃ। এবং বাস্তব বাদী, যুক্তিবাদী, বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন অসিত চৌধুরী নিজের এই রহস্যময় পরিবর্তনে হাসলো। হেসে বাড়ীতে ঢুকতে গিয়ে দেখলো ঘর থেকে নারায়ণ সামন্ত বার হচ্ছেন। ভদ্রলোক অনেক উপকার করেছেন, এখনও করছেন—তবু মনটা কেমন বিরূপ হয়ে উঠলো। বোধ হয়,

বাড়ীওয়ালাদের প্রতি ভাড়াটেদের সহজাত বিরুদ্ধতাই এর কারণ। উনি অন্ধকারে দেখতে না পান কামনা করলেও, সামন্ত মশাই দেখলেন। এবং থামলেন।

—এই যে, বাবাজী, তোমাব কাজেই গেসলুম। তুমি নাকি বাড়ীতে থাকোই না শুনলুম। খুব খাটুনি পড়েছে বুঝি ?

অসিত আবার হাসলো। এবার যথাসম্ভব করুণ করে। কিন্তু উত্তর দিল না।

—তা তো খাটতেই হবে। ছেলেব বাবা হয়েছো—দায়িত্ব তো কম নয়।

তবু যেন, অসিতের মনে হলো নারায়ণ বাবুর স্বরে আগের সেই আন্তরিকতার ছোঁয়াটুকু আর নেই। আসল বক্তব্যটা কি ?

নারায়ণ বাবু বেশীক্ষণ দেরী কবলেন না। খুব বিনয় করেই ভূমিকা স্বরু করলেন, তুমি তো জানো, দায়িত্ব আমারও কম নয়। পাঁচটা মুখের খাওয়া জোটাতে হয়। রোজগার কি আব করি। ভরসা এই পৈতৃক বাড়ী খানা। তাও বহু বছর সারাই না করায় কি অবস্থা তো দেখছোই। ভাবছি, এবার কিছু মেরামত করতে হবে। কিন্তু টাকা কোথায় ?

এতক্ষণ অসিত হুঁহাঁ করছিল, এবার শংকিত হলো। শংকা নিজের, কিন্তু শংকা জাগানোব ভার অপরের ওপর। তাই অনিবার্য ভাবেই কথাটা এসে পড়লো।

—তুমি পঞ্চান্ন টাকায় ভাড়া নিয়েছিলে. সেটা যে অনেক কম তা তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করো।

হঠাৎ প্রশ্ন কবে বসায় অসিতকে উত্তর দিতেই হলো, তা তো বটেই।

—এবাড়ী আমি আশী টাকাতে ভাড়া দিলেও কারোর কিছু বলবার নেই। এই পঁচিশ টাকা আমার ক্ষতি হচ্ছে তো ? তার ওপর, তোমার যা অবস্থা—তিন মাসের ভাড়াই দিতে পারো নি—তোমাকে তো বাড়াতে বলতে পারি না। তাই, তোমাকে বলবার কথা হোল, যদি তিনমাসের পাওনাটা অন্তত দিয়ে দাও—তবে আমি ছোটখাট রিপেয়ারগুলো ক'রে নিতে পারি। যদিও তোমাব ওপর এখন চাপ দেওয়া আমার উচিত

নয়, তবু একটু চেষ্টা করো—টাকার জোগার হয়তো হয়ে যাবে। নইলে আরেকটা কাজ করতে পারো, নারায়ণ বাবু গলা খাটো করলেন অকারণেই, সাধ্যে কুলোয় এমন ভাড়ার বাড়ী একটা দেখে নিতে পারো। আমার পাওনা নয় ধীরে ধীরে শোধ দেবে। তুমি কি বলো?

প্রশ্নে দিশেহারা অসিত বলতে যাচ্ছিল, কিছুই বলি না। না ব'লে বললো, সে তো ভাল কথাই বললেন। আমি কি আর বুঝি না? কিন্তু আমার যা অবস্থা—

—সে কি আর জানি না? নারায়ণ বাবু বললেন, তবু একটু ভেবে দেখতে বলি। এদিক ওদিক দেখো—মাস শেষ হতে তো এখনও দেড় হপ্তা দেরী আছে।

নারায়ণবাবু চলে গেলেন। দরজার সামনে, অসিত ঢুকবে কি ঢুকবে না, ইতস্ততঃ ক'রে, ফের বেরিয়ে এলো। একটু এদিক ওদিক দেখা দরকার।

এই এক ঝামেলা। আরেক ঢেউ—সী অব ট্রাবল্স। কি দিয়ে রুখবে এই ঢেউ? কোন অস্ত্রে? ক্যানিউট রাজাই পারেননি, অসিত তো কোন ছার।

বাড়ী খুঁজে দিতে পারে—এমন চেহারার লোক প্রথমে চট ক'রে মনে পড়ে না। পরিচিতের সংখ্যা আগে অগন্য ছিল, এখন কারোর সংগে দেখাও হয় না। অনেকক্ষণ ভেবে সম্ভাব্য যার কথা মনে পড়লো —সে চারুদা। এই লোকই উপযুক্ত। তাছাড়া অসিত প্রতিশ্রুত ছিল দেখা করবার জন্যে। আরেকটা ব্যাপার মনে এলো, টাকা বাঁচানো, কিন্তু সেটা ভাবতে গিয়ে লজ্জিত হলো।

ডিসপেনসারীটা বেশ বড়। সেদিন রাত্রে বুঝতে পারেনি, আজ অজস্র আলোয় মনে হলো, চারুদার ভাগ্য ভাল। কাউন্টারের ওপাশে তিনজন—তার একজন চারুদা। অসিতকে দেখে আনন্দিত হলো। উঠে বেড়ার এপাশে এলো। একটা বেঞ্চের ওপর নিজে বসলো, অসিতকে বসালো।

—তুই মাইরি এত মিথ্যেবাদী।

—প্রথমেই গালাগাল?

—করবো না? কাল পরশুই আসবো, চারুদা কৃত্রিম স্বরে বললো, এই তোর কাল পরশু?

—তুলোর দাম বাকী ব'লে বলছো?

অসিত জানে, এমন না বললে চারুদাকে নিরস্ত করা যাবে না। মোক্ষম অস্ত্র—চারুদা স্থির দৃষ্টিতে তাকালো।

—শোন চৌধুরীবাবু, তোমরা শিক্ষিত লোক, আমরা মূর্খ, কিন্তু মিথ্যে কথা বলিনা। দাম দিতে হয় দিয়ে চ'লে যাও। আমার কাজ আছে।

চারুদা রেগেছে। এবার অসিতের কাজ হলো তার রাগ ভাঙ্গানো। ম্লানস্বরে, অনুনয় বিনয়ে, হেসে, রাগ দেখিয়ে, শেষে সত্যিই চলে যাবার ভয় দেখিয়ে রাগ ভাঙাতে হলো। রাগ যেতেই চারুদা ফের মুখর হ'য়ে উঠলো। আগেকার কথা, অসিতের শুনতে আজকাল যেন ভালই লাগে—যা' কিছুদিন আগে লাগতো না, শুনলো। বৌদির মৃত্যুর কথা, কৌশল ক'রে ছেলেটাকে তার মাসী বাড়ী পাঠানোর কথা, আত্মীয় স্বজনের নির্মমতার কথা। কোন কিছুতেই বিচলিত না হবার উপদেশ দিয়ে শেষ করতে গিয়ে চারুদার হঠাৎ মনে পড়লো, হ্যাঁরে অতরাত্রে সেদিন তুলোর কি দরকার হ'লো?

অসিত নির্লিপ্ত স্বরে বললো, বৌয়ের ছেলে হলো কিনা, সেইজন্য।

—ছেলে হলো? কার বৌয়ের।

—আমার?

—সে কিরে? ছেলে হয়েছে? তোর ছেলে হয়েছে? বিয়ে করলি কবে? আগে বলিসনি তো?

—বলতে আর দিলে কোথায়?

—দূর, বিশ্বাস হচ্ছে না। কবে বিয়ে হলো?

—তা বছর দুয়েক তো বটেই।

—তোর ছোট ভাই, কি যেন নাম—তার সংগে তো মাঝে মাঝে আগে দেখা হোত—কিছু বলেনি তো কোনদিন।

অসিত সংক্ষেপে নিজের অবস্থা জানালো, ডাক্তারের প্রসংগ আর আনলো না। ছ'মাস চাকরী নেই শুনে চারুদা চিন্তিত হলো। বাড়ীর দরকার শুনে অনেকক্ষণ কি যেন ভাবলো। শেষে বললো, একটা

বাড়ীর খোঁজ পেয়েছিলাম কিছুদিন আগে। এখনও আছে কিনা জানিনা।

—একটু খোঁজ নাও না।

—নেবো। খুব ভাল নয়, তবে ভাড়াটা কম আর সবকিছু আলাদা আছে—এই যা সুবিধা।

—ভাল না হোক, তুমি খোঁজ নাও। ভাল খারাপ বিচার করবার সময় এখন আমার নয়।

—হ্যাঁ আমিও তাই বলি। দুঃখ কষ্ট তো কিছুদিনের—কোনরকমে কাটিয়ে দিতে পারলেই আবার সুখ। সুখ আসবেই—শুধু ধৈর্য ধ'রে থাকা চাই। ভেঙে পড়লি কি সব মাটি। অবস্থা ফিরলে ভাল বাড়ী দেখে চ'লে যেতে কতক্ষণ?

চারুদার মুখে আশ্বাস শুনে অসিত মনে মনে হাসলো। প্রকাশ্যে মাথা নেড়ে সমর্থন জানালো। আর ঠিক করলো পকেটের দশটাকা পকেটে থাকাই ভাল। কখন দরকার লাগে ঠিক নেই। বললো, তোমার দোকানে এই ওষুধটা আছে?

চারুদা কাগজটা হাতে নিল।

—আছে। পাঁচটাকা আটাশ নয়া পয়সা।

—ওরে বাবা, অত দাম? তাহলে থাক।

—থাক কিরে? বাচ্চাদের পক্ষে চমৎকার ওষুধ—তিন চারটে ফাইল অন্তত খাওয়া।

—চমৎকারতো বুঝলাম। কিন্তু পকেটের অবস্থাও তো চমৎকার।

—নিয়ে যা। পরে দিয়ে দিবি।

—ছি ছি, এমনি ক'রে যে ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে।

—যাচ্ছে তো তোর কি? এখন যেমন তেমন ক'রে চালিয়ে যা। লজ্জা করলে মরবি।

—না, লজ্জা নয়, তবে—

—তবে আবার কি। চারুদা বললো, তোরা রাজনীতি করিস, ভাবিস, জীবনটা বুঝি খুবই সোজা। একটু আন্দোলন করলে, দুয়েকটা জিগির তুললেই সমস্যা মিটে যায়। অত সোজা নয়—নানান কৌশল

ক'রে চলতে হয়। এখন ছেলের বাপ হয়েছিস, দেখবি, কত অপমান, কত দুশ্চিন্তা, কত আঘাত আসবে। সেটা রাজনীতি নয়—সংসার। রাশ একটু আলগা করেছিস কি সব ভেসে যাবে। সাবধানে চলতে হবে—দেখবি. এইসা দিন কভী নেহী রহেগা।

হঠাৎ চারুদার হিন্দীতে উত্তরণ দেখে অসিত শংকিত। বললো, রাত হচ্ছে। চলি ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। চারুদা উঠে গিয়ে ওষুধটা নিয়ে এলো। বললো, তাড়াতাড়ি চ'লে যা। এখন আড্ডা ছেড়ে বাচ্চাটাকে মানুষ কর।

অসিত হাসলো। ওষুধ নিয়ে, বাড়ীর খোঁজ নিতে ব'লে, দু'এক দিনের মধ্যেই আসার কথা দিয়ে, চলে এলো।

চারুদার সংগে দেখা করার পর মনটা কেমন বেশ ভাল লাগছে। আশা-নৈরাশ্য দুইই বড় সংক্রামক। এবং দুইই বড় অবাস্তব হাস্যকর। হোক হাস্যকর, ভিত্তিহীন—তবু প্রয়োজনীয়। সন্ধ্যেবেলাকার গ্লানি তো অনেক হাল্‌কা লাগছে এখন। এমনি অবস্থা, অসিত মনে মনে হাসলো, চারুদাও কাজে লাগে।

বাড়ী ফিরে অসিত তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল। অনেকদিন পরে সত্যিকারের ক্ষিধে পেয়েছিল আজ। ভাত এখনও গরম—রমা নিশ্চয় কিছুক্ষণ আগেই খেয়ে গেছে। আজ আর কোন কথা নয়—আজ একটু ঘুমোতে হবে। অসিত তাড়াতাড়ি ভাত শেষ করলো। রমার ঘরে মৃদু নীল আলো। ঘুমিয়েছে কি ? ঘরে ঢুকে দেখলো, ঘুমোয়নি—শোবার আয়োজন চলেছে। অসিত বাচ্চার ওষুধটা দিল, উপকারিতার কথা বললো, ব্যবহারবিধি জানালো, কি ক'রে ফোঁটা ফেলতে হবে শেখাল। এবং শুতে ব'লে বেরিয়ে আসবে এমন সময় রমা বললো, কাকাবাবু এসেছিলেন।

—দেখা হয়েছে।

—কি ঠিক করলে ?

—বাড়ীর খোঁজেই তো গিয়েছিলাম। একটা পেয়েছি।

—কেমন ?

—বাড়ীটা কালিঘাট অঞ্চলে। ভাড়া কম শুনলাম। দুচার দিন বাদে পুরো খবর পাবো।

—পোষ্টাফিসে কত আছে?

অসিত রমার দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসলো।

—কিচ্ছু নেই।

—তবে? বাড়ী ছাড়তে খরচ হবে না?

—তুমি ছাড়তে বারণ করছো?

—কিছুই বলছি না। শুধু ভেবে দেখতে বলছি।

—আমার নিজের ছাড়বার ইচ্ছে নেই। অসিত যেন ঠিক গুছিয়ে বলতে পারলো না, তবে ছাড়তে তো হবেই।

—ছাড়তেই হবে বলছো কেন? কাকাবাবুর পাওনা শোধ দিয়ে যদি কিছু ভাড়া বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহ'লে?

—সে তো যায়ই। কিন্তু টাকা কোথায়?

রমা অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। অসিতের অস্বস্তি লাগে। রমা মুখ তুললো। বললো, টাকা নেই তো রাজ্যের ওষুধ আনো কি করে?

প্রশ্ন শুনে অসিত একটু বিস্মিত হয়ে তাকালো। টাকার অভাব কি রমা বিশ্বাস করছে না? বললো, এখন অবধি একটারও টাকা লাগে নি।

—এই ভিক্ষে তুমি নিচ্ছ কেন?

—ভিক্ষে নয়, বাঁচতে হবে তো?

—বাঁচতে হবে? এমনি ক'রে?

রমার কথায় গায়ে জ্বালা ধরে। তবু অসিত সংযত হয়েই বললো, ডাক্তারের ওপর বিরূপ বলেই তুমি সব কিছু তার খারাপ মনে করো। কিন্তু ডাক্তার সত্যি অত খারাপ নয়। তার কী স্বার্থ আমায় সাহায্য করায়। সে তো বলছে, বলে অসিত ডাক্তারের প্রস্তাবের কথা বললো। রমা স্তব্ধ বিস্ময়ে শুনলো। অসিতের শেষ হলে একটু উচ্চকণ্ঠে বললো,

—তুমি একথা চুপ করে শুনলে?

—শুনবো নাতো কি। প্রস্তাবটা একেবারে অসম্ভব কিছু নয় তো।

—নয়? তুমি একথা বলছো? তুমি কি এতই অক্ষম যে স্ত্রী পুত্র বেচে দেবে?

—বেচে দেবার প্রশ্ন নয়। আইনের প্রশ্নও আছে এর মধ্যে।

—কী, ডাক্তার আইন দেখাচ্ছে ?

—দেখাচ্ছে না। দেখাতে পারে।

—ছিঃ তুমি এত ভীরু।

—হয়তো ভীরুই। অসিত উঠলো, এবং নিষ্ঠুর কণ্ঠে বললো, ভেবে দেখো, রাজরাণীর মত থাকতে পারবে। বাচ্চাটা মানুষ হবে। একটা ভীরু নপুংসক ছেলেকে স্বামী বলে পরিচয় দিতে হবে না।

—শোন, যে ক'রে হোক টাকা জোগার ক'রে ডাক্তারের সব টাকা শোধ দিয়ে দেবে। রমা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে অনুনয় ক'রে বললো, আমাকে এমন ক'রে ব্যর্থ ক'রে দিও না।

অসিত নিজের ঘরে চলে এলো। আলো জ্বাললো না। অন্ধকারে থাকতে ভাল লাগলো। হাঁটতে ভাল লাগলো। ঘুমের কথা মনেই এলোনা আর।

চারদিকের টান সমান থাকলে কোন বস্তু কেন্দ্রচ্যুত হয় না—বিজ্ঞান বলে। বিজ্ঞানের ছাত্র অসিত চৌধুরীও দিনসাতেক অনড় হ'য়ে রইল। যে কোন একদিকের আকর্ষণ বৃদ্ধি বা লাঘব হবার প্রতীক্ষায় সে কোথাও যায়নি, কারোর সংগে দরকারি কথা বলেনি, কোন ভাবনা ভাবেনি। আপন মনে ঘুরেছে, পার্কে বসেছে, গাছের পাতা ঝরা দেখেছে, পথের মানুষ গুনেছে, অজস্র অজ্ঞাত দ্বীপে—দ্বীপের ইতিহাস অনুভব করেছে, ইতিহাসের মতই প্রাক্তন স্রোতের স্থবির সাক্ষী হতে চেয়েছে। রোববার গেল, ব্যানার্জী সাহেবের কথা মনে পড়েনি। কত আগামীকাল গেল, পরশু গেল, ডাক্তারের কাছে ওষুধের জন্য যায়নি। এখনও বাড়ীতে মায়ের কাছে যাওয়াই হ'য়ে ওঠেনি। মনে নেই।

মনে নেই ? অসিত ভাবে, আর হাসে। বিস্মৃতির মনোবৈজ্ঞানিক কারণগুলো জানা আছে—নিজের আচরণে তার প্রকাশ দেখে আজ আর অবাক হয় না। স্বীকার ক'রে নেয়।

মায়ের সংগে দেখা না করলেও বাড়ীর খোঁজ সে পেয়েছে। বিশু পশ্চিম জার্মানী যাওয়ার চেষ্টা করছিল। আজকাল সবাই করে। সব

কোম্পানীর দুঃখ জানানো চিঠি পেতে পেতে হঠাৎ নাকি রাউরকেল্লায় একটা চাকরী পেয়ে গেছে—সামনের মাসে যেতে হবে। যা হোক, মন্দের ভাল। খাঁটি জার্মানী না হোক, সেখানকার গন্ধ আছে। দুধের স্বাদ না মিটলেও ঘোল নিতে তো খারাপ নয়। ছেলেটা রাস্তায় মাস্তানি করলেও, চুলের পেছনে অনেকক্ষণ সময় দিলেও, ড্রেন পাইপ ট্রাউজার্স পড়লেও, নিজেকে গুছিয়ে নেবার এলেম আছে। ওকে বোঝা যায়, চরিত্রের একটা নিশ্চিত রং আছে। আর অসিত? একেবারে ডিষ্টিল্ড্ ওয়াটার (বাংলা কি, অসিত ভাবলো : পাতিত, না পরিস্রুত জল ?) নেই, স্বাদ নেই, গন্ধ নেই।

বিশু বাড়ীতে কিছু পাঠাতে পারবে কিনা কে জানে। বিনু অখ্যাত সওদাগরি অফিসের টাইপিষ্ট। শ'খানেকের বেশী নিশ্চয়ই পায় না। আর আছে বাড়ী ভাড়ার ষাট টাকা। মা আর বিনুর মোটামুটি চ'লে যাবার কথা। গোলকবাবু বহুদিনের ভাড়াটে—ঠিক মত দিচ্ছেন তো? বিশু যাবার আগেই একদিন যেতে হবে। সব ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে আসতে হবে।

মাঝে একদিন চারুদার কাছে গিয়েছিল। কোন দরকারে নয়, এমনিই। পূর্বজন্মের ঐ একজনই আছে, যে পালটায়নি, যার অবাস্তব অযৌক্তিক আশাবাদিতা সত্যিই ছোঁয়াচে। ঐ একজনের কাছে গেলেই অসিতের নিজেকে জাতিস্মর মনে হয়। প্রাক্তন অসিত চৌধুরীকে দেখতে পায়, ভাল লাগে। একটা স্বপ্নের মত মনে হয়। একটা শৌর্যের স্বপ্ন। ক্ষীণকোটি সোনালী সিংহের স্বপ্ন।

চারুদা ছাড়লো না। বাড়ীতে এলো। রমার সংগে পরিচয় হ'লো। বৌমার সংগে কথা ব'লে চারুদা ভারী খুসী। ঠিক নাকি সে যেমন ভেবেছে, তেমনি মেয়ে রমা।

—বুঝলে চৌধুরীবাবু, হরের জন্যই গৌরী জন্ম নিয়েছিলো। কৃষ্ণের জন্য রাধা। চারুদা দুলে দুলে বলেছিল, তেমনি তোমার জন্য রমা। বৌমাকে আমার কষ্ট দিও না—মাথায় ক'রে রেখো।

—বলুনতো চারুদা, রমা বলেছিল, ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলুন। মাঝে মাঝে একথা ওর মনে থাকে না। আমাকে বড় কষ্ট দেয়।

—সেকি। তুই এত বড় পাষণ্ড ? মা আমার সাক্ষাত গণেশ-জননী।

—আশ্চর্য! তুমি এসব ধর্মকথা শিখলে কোত্থেকে ?

—ও কি শিখতে হয় ? চারুদা একটু লজ্জা পেয়ে বলেছিল, সৎসঙ্গে এলে ভাল কথা আপনিই বেরোয়।

—গণেশ জননী। তা মন্দ বলোনি। অসিত হতাশ ভংগীতে বলেছিল, আমার তো প্রায় গণেশ-পিতার হালই হয়েছে। এখন ভরি খানেক ভাং আর একটা ভিক্ষাপাত্র হ'লেই হয়।

—তোর এইতো এক রোগ। সবকিছুতে এত ভেঙ্গে পড়িস। মহাদেবের ভিক্ষাপাত্রটাই দেখলি—রুদ্র রূপটা দেখ।

—রক্ষে করো। রুদ্ররূপে আর কাজ নেই।

—সত্যি চারুদা, রমা অনুযোগ করেছিল, ও এত হতাশ হয়ে পড়ে, আমারই মাঝে মাঝে ভয় হয়।

হাসিঠাট্টার মধ্যে সময় কেটেছিল মন্দ নয়। এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না। কিন্তু যায় না। আর যায় না বলেই অসিতকে ডাক্তারখানায় যেতে হলো।

কারণ গত রাত্রে নারায়ণবাবু এসেছিলেন। রমার ঘরে বসলেন। অসিতও ছিল। প্রথমে বাচ্চাটাকে আদর করলেন, মানুষ করার পরামর্শ দিলেন, স্বভাবসিদ্ধ করুণা প্রকাশ করলেন, নিজের দুঃখের কাঁদুনি গাইলেন। প্রথম পর্ব শেষ হ'লে অসিতকে বললেন,

—ডাক্তারের খবর শুনেছ ?,

—না, কেন কি হয়েছে ?

—একটু পুলিশের ঝামেলায় পড়ে গেছে বেচারী।

—পুলিশ ? রমা নির্লিপ্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো, পুলিশ কেন ?

—বোধহয় ইনকাম ট্যাক্সের ব্যাপার। নারায়ণবাবু বললেন, আয় করেতো প্রচুর।

অসিতের একটা নাম মনে এলো: সুনন্দা ঘোষ। জিজ্ঞাসা করলো,

—আপনার সংগে কবে দেখা হয়েছে ?

—গতকাল। গিয়েছিলুম পেটটা একটু দেখাতে। দেখি ডাক্তার হেঁটে হেঁটে আসছে। জিজ্ঞাসা করলুম—কিহে গাড়ী কোথায় ? বললে

বেচে দিয়েছি। বললুম, কেন ? বললে, শালারা আর বাঁচতে দেবে না। বুঝলুম পুলিশের কথা বলছে। এ কথা সে কথার পর তোমাদের কথা বললে।

দুজনেই ইচ্ছে হলো জিজ্ঞাসা করে কি কথা। কিন্তু প্রশ্ন না ক'রে চুপ ক'রেই রইল।

—তোমাদের অসুবিধার কথা অনেকবারই বললে। দেখলুম, নিজের চিন্তা তো আছেই, তার ওপর তোমাদের চিন্তাও খুব ক'রে। নারায়ণবাবু অসিতের দিকে ফিরে বললেন, তোমার খুব প্রশংসা করলে। আরেকটা কথা, সেটা বলতেই আমি এসেছি।

নারায়ণবাবু একটু চুপ করলেন। খবরটাকে যথাসম্ভব আকস্মিক করতে চেষ্টা করলেন বোধ হয়। কিন্তু ঐ কায়দায় অসিত আর আজ-কাল উৎসাহ পায় না। রমা নির্লিপ্ত। নারায়ণবাবু বললেন, তোমাদের তিন মাসের পাওনা আর এ মাসের ভাড়া সবটাই ডাক্তার দিয়ে দেবে বলেছে। এ যেন আবার তোমরা তাকে ব'লো না।

—দিয়ে দেবে মানে ? এতক্ষণে রমা কথা বললো। স্বর রুক্ষ।

—দেবে মানে তিন মাস দিয়েছে। এ মাসেরটা পরে দেবে বলেছে।

রমা স্তব্ধ হ'য়ে রইল। অসিত কিছু ভাবলো না। আরো কিছুক্ষণ নারায়ণবাবু রইলেন। টাকা পাওয়ার পর তিনি যে আর উঠতে বলতে পারেন না, সে কথাও বললেন। আইন আছেতো ? তবে ভাড়াটা সামান্য বাড়ালে ভাল হ'তো। তিনি ডাক্তারকে একবার এ বিষয়ে ব'লে দেখবেন।

—আপনি আর কিছু বলবেন না। রমা বললো, যা বলার হয় আমরাই বলবো।

—তা হলেতো ভালই হয়। আমার সংগে বন্ধুর সম্পর্ক তো, ঠিক বলতে পারি না। লজ্জা করে।

—আপনাকে আর লজ্জা পেতে হবে না।

রমা এমন ক'রে কথাগুলো বললো যে তারপর আর নারায়ণবাবুর বসা চলেনা। উঠলেন। বললেন, ডাক্তারের মত লোক হয় না।

চলে গেলে রমা অসিতকে বললো, অমন লোক হয় না বলেই তুমি

কাল তার কাছে যাবে। জিজ্ঞাসা করবে এসবের মানে কি ? আমরা তাঁর করুণার প্রত্যাশী নই। যদি কোন বদ মতলব থাকে, বোলো, তা' পূর্ণ হবে না।

—মতলব বলছো কেন ? এটা তো—

—তুমি তাকে মহাপুরুষ হিসেবে দেখছো, আমি তার অন্য রূপ চিনি। যা বলছি করো।

—দেখো রমা, আমরা সব কাজ করি একেবারে নিজেদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর ক'রে। ব্যক্তিগত সেন্টিমেন্টের আলোয় বিচার করলে সব সময়ে আমরা ঠিক নাও হতে পারি। তুমি ডাক্তারকে ভয় করো, ঘৃণা করো,সে সম্পূর্ণ তোমার এই সম্পর্কে একটি মাত্র মনোভাব গড়ে উঠেছে বলে। তোমার সম্মান, তোমার ভ্যানিটির জন্য এই সুযোগকে তুমি ডাক্তারের মতলব বলে মনে করছো। মানুষকে কি অত সহজে চেনা যায় ? তুমি তাকে ভয়ের চোখে দেখ বলে বিচার করতে পারো না। ভাল করে ভেবে দেখো, তার কি দোষ ? তুমি কি তাকে হতাশ করোনি ? বঞ্চিত করোনি ? বাচ্চাটার ভবিষ্যতও তো ভাবতে হবে। আমি কদিন, তুমি কদিন—ঐ তো আমাদের থাকবে। ওর থাকাটাকে একটু সহজ করা যায় না ?

অসিত এমন করে এতগুলো কথা অনেকদিন বলে নি। একটু উত্তেজিত মনে হলো নিজেকে। কান গরম হয়ে উঠেছে। হাত কাঁপছে কি ? বুঝতে পারলো না।

—তুমি কি সত্যি আমাকে চলে যেতে বলো ?

রমার প্রশ্নে হঠাৎ গলার কাছটা ব্যথা করে অসিতের। এমন করে তো কোনদিন ভাবে নি। চলে যাওয়া মানে কি ? একবার রমার হাত ছোঁওয়ার ইচ্ছে হলো। ধরলো না, বললো, আমি জানি না। কি করতে হবে, বলো ?

রমা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। পরে ধীরে ধীরে বললো, যদি আমাকে তোমার ক্লান্তিকর মনে হয়—তবে স্পষ্ট করে বলো। আমি নিজের পথে চলে যাবো।

—ওকথা রাখো। অসিত একটু জোর দিয়ে বললো, কি করবো, বলো ?

রমা অসিতের দিকে তাকিয়ে বললো, চারুদার কাছে গিয়ে বাড়ীটার খোঁজ নেবে। আর ডাক্তারকে বলবে, আমাদের কাছে দুমুঠো ভাতের থেকে শান্তি অনেক বড়। আর তুমি বেকার হলেও অক্ষম পিতা নও।

অসিত নিঃশব্দে উঠলো। বেরিয়ে গেল। এবং তাই সকালে, ডাক্তারখানায় যেতেই হলো তাকে।

ডাক্তারখানার দরজা বন্ধ। গ্যারেজ বন্ধ, ভেতরটা খালি। পাশের দরজাটাও বন্ধ। অসিত বিমূঢ় হ'য়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর, শুধু এতখানি হেঁটে আসার জন্যই, দরজার ক. নাড়লো। অনেকক্ষণ বাদে দরজা খুললো। নাকখাঁদা দরোয়ান, যার ... বাহাদুর, সন্ত্রস্ত মুখ বের ক'রে চিনতে পারলো। বাংলাতেই বললো,

—ও আপনে। আসেন।

—ডাক্তারবাবু কোথায় ?

—বেরাইছে। বসেন।

ভেতর দিয়ে ডিসপেন্সারীতে ঢুকতে হলো। ঘরটার অবস্থা শোচনীয়। চারদিক অগোছাল। আলমারীগুলো ফাঁকা। টেবিলের ওপর কাগজের স্তূপ, শিশি বোতল' কয়েকটি ঝাড়ন। চেয়ার, একটা বাদে, সব উধাও। দেয়ালে আলোর টিউবগুলো নেই। একটা ঝড় গেছে। কিন্তু কেন ?

—কি ব্যাপার বাহাদুর ?

—পুলিশ।

—কেন পুলিশ কেন ?

বাহাদুর মাথা নাড়লো। ব্যাপারটা সন্দেহজনক, কিন্তু ঠিক কি, বুঝতে না পেরে অসিত বেরিয়ে এলো। তার পর দিন গেল, ডাক্তার নেই, দেখা হলো না। 'তাবপর দিনও না। চারুদার খবরও নৈরাশ্যজনক। আগের বাড়ীটা হাতছাড়া হয়ে গেছে। তবে আরেকজন অন্য একটা বাড়ীর খোঁজ এনেছে। দুচারদিন না গেলে খবর পাওয়া যাবে না চারুদা নাছোড়বান্দা। আরেকটা ফাইল হাতে গুঁজে দিল। যথারীতি পরে দাম দেবার শর্তে।

বেশীদিন উদ্বেগ নিয়ে থাকতে হলো না। দুদিন পরে, ডাক্তারের

দরজা ধাক্কালে বাহাদুর কিছু মনে করাব কিনা, যখন অসিত ভাবছিল—দরজা তখন আপনিই খুলে গেল। সীতা বেরিয়ে প্রথমে অসিতকে খেয়াল করেনি। অসিত ডাকলো। সীতা ফিরে অবাক হলো। বললো,

—কি খবর? এখানে?

—আমার জিজ্ঞাসও তো তাই।

—কেন, এটা তো আমাব কর্মস্থল।

—ছিল। এখনও আছে কি?

—সব শুনেছেন?

—আপনার এখানে চাকরী নেই জানি। আর কিছু জানি না।

—ডাক্তারবাবুর সংগে হপ্তাখানেক আগেও দেখা হয় নি?

—না। আছেন নাকি এখন?

—না।

—ব্যাপার কি? চারদিন বিভিন্ন সময়ে এসে তাঁকে ধরতে পারলাম না।

—তাঁকে কি খুব দরকার?

—ছিল একটু দরকার।

—দেখা হবে না।

—কেন?

—ডাক্তারবাবু অ্যাবেষ্টেড।

—অ্যাবেষ্টেড! কবে?

—পরশু রাত্রে।

—কারণ?

—সে অনেক কাণ্ড। চলুন, বলছি। এখানে দাঁড়ানো ঠিক হবে না।

চলতে চলতে অসিত সীতাকে দেখলো। বারো তের দিন আগে দেখা হয়েছিল, একদিনে চেহারাটাই পালটে গেছে মেয়েটার। রীতিমত কালো দেখাচ্ছে আর রুগ্ন, যদিও একটু ফোলা মত। সামান্য বসা চোখের কোলে দুশ্চিন্তার অন্ধকার। দৃষ্টি অশান্ত।

সেই আগের রেস্তোরাঁ। কেবিনে সীতা অসিতের পাশেই বসলো,

আগের মত মুখোমুখি নয়। অনেকক্ষণ দুজনে চুপ—মনে পড়তে অসিত জিজ্ঞাসা করলো, তারপর, ব্যাপার কি বলুন তো ?

—এই ডক্টর্স ক্লিনিকে কি হতো, আপনি জানতেন ?

—না।

—এটা একটা বেআইনী মেটারনিটি হোম গোছের ছিল। যাদের নানান কারণে হাসপাতালে যাবার উপায় থাকতো না, তারাই এখানে আসতো। বেশীর ভাগই অ্যাবরশান, নয়তো মিসক্যারেজের কেস। এটাই ডাক্তার-বাবুর আসল ব্যবসা ছিল, সামনের ডিস্পেনসারীটা লোক দেখানো।

—আপনি এসব জানতেন ?

—জানতাম।

—তবে এখানে ছিলেন কেন ?

—কেন থাকবো না। সীতা তীক্ষ্ণস্বরে বললো, আপনি কি আইন, নীতি এসব কিছু বলতে চাইছেন ?

সীতার উত্তেজনায় অসিত বিস্মিত হ'য়ে তাকালো। একটু পরে বললো, ওসব বাজে সংস্কার ব'লে উড়িয়ে দিলেও বাস্তব ক্ষেত্রে ফল তো আপনার ভাল হলো না।

—সে আমার একগুয়েমি, আর ডাক্তারের বোকামির জন্য।

—মানে ?

ডাক্তারখানাটার ওপর পুলিশের হয়তো নজর ছিল, আগে থেকেই। কিছুদিন আগে ডাক্তারের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর নিয়ে, ইন্‌কাম ট্যাক্সের রিটার্ণ নিয়ে চিঠিপত্র আসে। পুলিশ এসে কি সব এনকোয়ারী করে গেছে। নার্স হিসেবে সীতার যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। সুনন্দা ঘোষ হলো বোঝার ওপর শাকের আটি। মেয়েটা মরলো—ডুবিয়ে গেল সবাইকে।

—কিন্তু মরলো কেন ?

—সময় হয়েছিল তাই।

—আপনার সেদিনকার কথায় তো তা' মনে হচ্ছিল না।

সীতা তাকালো। কি যেন ভেবে বললো, এত নগ্ন আর দুঃখী মেয়েটা। ওর বেঁচে থেকে কি হবে ? ব্যানার্জী সাহেব চেয়েছিলেন নর্মাল ডেলিভারী। কিন্তু সুনন্দাই আমাকে মিসক্যারেজের কথা বলেছিল।

—সে কি! কেন?

—কেন বলবে না? ব্যানার্জী সাহেবকে বিশ্বাস কি! মহানুভবতা তাঁর শখ হতে পারে—কিন্তু সুনন্দাকে তো এই ক'রেই খেতে হ'তো। ও বাঁচবে না?

—কিন্তু বাঁচতো পারলো না।

—তা' পারলো না। দারুণ হ্যামারেজ হচ্ছিল। হবে না? দেড় বছরে দুবার ওকে আসতে হয়েছে এখানে। অবশ্য ওরা যতবার আসে ততই আমাদের লাভ। কিন্তু সেই যন্ত্রণা? দেখেন নি তো— পাগল হয়ে যেতেন। ডাক্তারকে না জিজ্ঞাসা করে আমিই একটা ওষুধ দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, অনেকক্ষণ ঘুমোলে হয়তো সুস্থ হবে। কিন্তু শরীরে কিছুই ছিল না—বাঁচবে কোত্থেকে। শুধু ইচ্ছেতে কি বাঁচা যায়? মেয়েটা এত বোকা ছিল—সবাইকে বিশ্বাস করতো। এমন কি আমাকেও।

সীতা চুপ ক'রে রইল কিছুক্ষণ। অসিতও। এত নগ্ন ক'রে এই কথাগুলো বলা যায়? স্তব্ধতা ভেঙে সীতাই প্রথম কথা বললো,

—আপনার সংগে যেদিন বিকেলে দেখা হলো, সেদিন সকালেই আমি জানতাম আমার চাকরী নেই। ব্যানার্জী লোকটা একটু বোকা মত—ভেবেছিলাম, ওকে দিয়ে আমিও কিছু গুছিয়ে নেব। সুনন্দাটা ম'রে সব মাটি ক'রে দিল। সীতা হাসি ছোঁওয়ানো মুখে একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, ব্যানার্জী সাহেব আমার সংগে সেদিন গেলেন, ভয়ানক চেঁচামেচি করলেন, পুলিশে খবর দিলেন। ডাক্তার তাড়াহুড়ো ক'রে আমাকে কিছু টাকা দিয়ে সেই রাত্রেই হষ্টেল ছাড়তে বললেন। নিজে যে কি করে এতদিন বাইরে ছিল জানি না—আমি এখন এখানে ওখানে ঘুরছি।

—মানে? আছেন কোথায়?

—কাল যেখানে ছিলাম আজ সেখানে থাকবো না। এখনও জানি না কোথায় থাকবো।

—কি বলছেন?

—কাণ্ডকারখানা দেখে শুনে খুব অবাক হচ্ছেন, না? ভাবছেন, একটা উপন্যাস ছাড়া এমন ব্যাপারও আবার হয়?

—হয় যে দেখতেই তো পাচ্ছি। কিন্তু কথা হচ্ছে, আপনি থাকবেন কোথায় ?

—যেখানে হোক থাকবো। বন্ধু-বান্ধবের তো অভাব নেই। অনেক শ্রীমানই আছেন যাঁরা আমায় থাকতে দিয়ে কৃতার্থবোধ করবে। সেই সুযোগগুলো নেব।

অসিত ভাবলো, ভাগ্যিস বিস্মিত হবার অভ্যাসটা আজকাল আর নেই। নইলে বোধহয় দমবন্ধ হ'য়ে যেত। কিন্তু মেয়েটার কথা একেবারেই বোঝা যায় না। তাই অসিত বললো, আমার সংগে চলুন একজায়গায়। আপনার থাকার একটা ব্যবস্থা করা যায় কিনা দেখি।

—আমার জন্যে এত ভাবছেন কেন ?

—কোন মতলব নেই।

—থাকলে বেঁচে যেতাম। যাই হোক, ডাক্তারকে জামিনে খালাস করতে হবে। লোকটা ধড়িবাজ আছে তো—বেরিয়ে ব্যবস্থা একটা কিছু করতে পারবেই।

সীতার বলার ভংগীতে এমন অসংকোচ পুরুষালি ভাব আছে— যা চমকে দেয়। অসিত বললো, চলুন, ওঠা যাক।

—একটা কথা বলবো ? সীতা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে হাসলো। বললো, আমি আপনার থেকে অনেক ছোট। আমাকে তুমি বলবেন।

—বলবো। এখন বার হওয়া যাক।

—চলুন।

চারুদার ডাক্তারখানা যে আজ বন্ধ থাকে সেটা জানা ছিলনা। হতাশ হ'তে গিয়ে চারুদাকে পাওয়া গেল ভেতরে। চারুদা দুজনকে দেখে বিস্মিত। ডাক্তারখানার ভেতরে বসালো।

—ডাক্তারখানা যে কোনদিন বন্ধ থাকে জানতাম না তো।

—এটা থাকে। মংগলবার সকালে এঁরা সব ধম্ম কম্মো করতে যান।

—তুমি যাও না ?

—আমি ? চারুদা হাসলো। সীতাকে ভাল ক'রে দেখে বললো, কি ব্যাপার ? এ কে ?

—এর নাম সীতা সেন। ভয়ানক বিপদে পড়েছে। কিছুদিন এর থাকবার একটা ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

চারুদার কপালে সন্দেহের রেখা জেগেই মিলিয়ে গেল। বেশ উৎসাহিত হয়েই অনুযোগ করলো, ফের রাজনীতি সুরু করেছ, বাবা? তোমার রোগ আর যাবার নয়। ক'দিন লুকিয়ে থাকতে হবে?

শেষ প্রশ্নটা সীতাকেই করা হয়েছে বুঝে, সীতা একটু বিব্রত হলো। অসিত বললো, যতদিন দরকার পড়ে। পারবে না?

—পারবো। চারুদা একটু ভেবে বললেন, তবে আজ এক্ষুনি তো পারছি না। কাল সকালের মধ্যে একটা ব্যবস্থা ক'রে দেবো।

—তা হলে, সীতা, তুমি কাল সকালে এসো। চারুদাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারো।

সীতা ম্লান হেসে মাথা নাড়লো। চারুদাকে বাড়ী খোঁজার কথা স্মরণ করিয়ে দু'জনে বাইরে এলো। সীতা বললো, কোনদিন কেউ আমার কোন উপকার করেনি। আমি চাইও না। আমার জন্য আপনার কষ্ট স্বীকারের হয়তো প্রয়োজন ছিল না। তবু আপনার উপকার নেবো। আমার জন্যে কেউ ভাবে—এই অনুভূতিটাই বোধহয় আমার সবচেয়ে দরকার।

—কৃতজ্ঞতা?

—কৃতজ্ঞতা আমি প্রকাশ করতে জানি না। আমি চলি।

—কাল চারুদার কাছে চ'লে এসো।

—আসবো।

—সীতা হঠাৎ দ্রুত চলে গেল।

বাড়ী ফিরে রমাকে ডাক্তারের সমস্ত কথা বললো অসিত। সীতার প্রসংগ আসতে শুধু নার্স ব'লে উল্লেখ করলো। নির্বাক হ'য়ে রমা শুনলো। পরে বললো, ওর বিরুদ্ধে চার্জ কি?

—তা' কে জানে।

—বোধ হয় দু'তিন রকম থাকবে। নার্সটাকে ধরে নি?

—না।

—ওর ডাক্তারখানা, বাড়ী-ঘর কে দেখছে?

—একটা দরোয়ান আছে। থাকলে কি হবে, সবকিছু ভয়ানক এলোমেলো অগোছাল হ'য়ে রয়েছে। সব চুরি হয়ে যাবে আরকি।

—তা তো যাবেই। কোন উকিল ঠিক করো। অন্তত জামিনে কিছুদিনের জন্য বাইরে না আনলে তো ওর সব যাবে।

—আমি ? অসিত, আরেক ঝামেলায় জড়াবার ভয়েই বোধহয়, বললো—আমি কাকেই বা চিনি ?

—ঐ দরোয়ানটাকে নিয়ে ডাক্তারের পেশেণ্ট বা বন্ধু বান্ধব কারোর কাছে যাও। নার্সটাকে পেলে ভাল হয়। আচ্ছা, আমাদের অফিসে ট্রাইব্যুনালের সময় এক অ্যাডভোকেটের সংগে তোমার যে খুব পরিচয় ছিল—কি যেন নাম—তাঁর কাছে যাওনা। তিনি কিছু সাহায্য করতে পারবেন।

—এখন আমি অফিসে নেই—যাওয়া উচিত হবে কি ? তা ছাড়া, এইসব নোংরা ব্যাপার নিয়ে—

—নোংরা কি পরিস্কার এ প্রশ্ন না তোলাই ভাল। লোকটার দেখবার তো কেউ নেই।

রমাকে বুঝতে পারে না অসিত। জটিল দুর্বোধ্য অমিল অংকের মত। অনেকক্ষণ ভাবতে চেষ্টা করলো, পারলো না।

—কি ভাবছো অত ?

—আচ্ছা, নারায়ণ বাবুকে বললে হয় না ?

—বলতে পারো, তবে একজন উকিলের সংগে কথা বলা দরকার আগে।

আর কোন কথা হ'লো না। বলার কথা আর কিছু ছিল না।

নারায়ণ সামন্ত জেলহাজত, পুলিশ কেস, ইত্যাদি শুনে কেমন ঘাবড়ে গেলেন। তবু তিনি অসিতের সংগে দুদিন ধ'রে কয়েকজন বন্ধু বান্ধবের বাড়ী ঘুরলেন। ডাক্তারের বান্ধবেরা রাজদ্বারের কথায় নানান ছুতোয় এড়িয়ে গেলেন। কোন উকিলের সংগে কথা বলা সম্ভব হলো না। কারণ, উকিল যে কাকে ডাক্তারের আত্মীয় বলে ঠাওরাবে, অসিত বা নারায়ণ বাবু মনে মনে সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হ'তে পারলো না। টাকা দেবে কে ? অতএব অনেক ঘোরাঘুরি ক'রে, নিজেকে মর্মের

বৃশ্চিক-দংশনের হাত থেকে বাঁচিয়ে, তুজন তুজনের অকথিত সম্পত্তি নিয়ে, হাল ছেড়ে দিল। অসিত রমাকে কিছু বললো না, নারায়ণ সামন্তই বলবেন—অসিত তা' জানে।

নারায়ণ বাবুর ঘোরা বন্ধ হ'লো—অসিতের হলো না। চারুদার কাছে গেল সন্ধ্যায়। গতকাল থেকে সীতা চারুদার ঠিক করা একটা বাড়ীতে আছে। ঠিকানা নিল অসিত।

সীতা সন্ধ্যায় অসিতের জন্য প্রস্তুত ছিল না। দেখে বিস্ময় প্রকাশ করলেও খুসী যে হয়েছে বোঝা গেল।

—ভেবেছিলাম কাল সকালে আসবেন। এসেছেন ভালই হোল। সারাদিন চুপচাপ থেকে থেকে একেবারে হাঁপিয়ে উঠছিলাম।

—অজ্ঞাতবাস কেমন লাগছে?

—কেমন আর লাগবে।

—আশপাশের লোক কি বলে?

—কিচ্ছু বলে না। চারুদাকে মেজদা বলি আমি ছোট বোন। স্বামী পরিত্যক্ত।

তু'জনে হাসলো। অসিত রমার কথা বললো। শুনে সীতা ভ্রু ওঠালো।

—বটে? তবে তো আপনার কপাল পুড়লো।

– কেন?

—রমাদি সাধ্বী স্ত্রী। স্বামীর এমন বিপদে স্ত্রী ছাড়া আর কে ভাববে বলুন! ডাক্তারবাবু একবার খালাস পেলে বোধ হয় রমাদি—

—তা নয় হয় তো। হয়তো বিপদগ্রস্থের জন্য স্বাভাবিক করুণা এটা।

—হতে পারে। আবার নাও হতে পারে, আপনি মেয়েদের চেনেন না।

—তা হয়তো সত্যিই চিনি না। শুধু মেয়ে কেন, কাউকেই চিনতে পারছি না।

—এর মধ্যেই আপনার চেনার সাধনা টাধনা সব উবে গেল?

—মানুষকে চেনা যায় তার যন্ত্রণায়। সেই যন্ত্রণারই থৈ পাচ্ছি না যে।

—আপনি ভীষণ বড় বড় কথা বলছেন। মাঝে মাঝে ভুল হয়—বুঝি সত্যি কথাই বলছেন।

অসিত হাসলো, কেন, সত্যি বলি না ?

—দূর, সব মনগড়া কথা। যন্ত্রণাকে জানবেন, বেদনার রং চিনবেন—এই করতে গেলে মানুষটাকে যে চেনাই হবে না। আমি বিপদে পড়েছি, উপকার করলেন। কিন্তু আমাকে চেনেন কি আপনি ?

—তোমাকে ? বললাম তো, কাউকেই চিনে উঠতে পারি নি।

—যাক গে। আমার একটা চাকরীর চেষ্টা করুন।

—আমি ? আমাকে কে দেয় তার ঠিক নেই।

—আপনি শিক্ষিত লোক, চেষ্টা করলেই হবে।

—রাজনীতির অপরাধে ছাঁটাই লোককে কেউ চাকরী দেয় না।

—আর আমার অবস্থা ভাবুন। একে অশিক্ষিত—তায় আবার বেআইনী কাজে লিপ্ত।

সীতা সব কথাই বলে, কিন্তু বলার ভংগীতে কথার গুরুত্ব কেমন যেন কমে যায়। ফলে হাসি হয়তো পায়, কিন্তু বোঝা যায় না কিছু। অসিত বললো, বেআইনী কাজ করতে কে বলেছে ?

—খাওয়াবে কে ? আইন সংগত কাজে আমরা বাঁচতে পারি ? কেউ বেআইনীভাবে বুদ্ধি বেচে, কেউ শ্রম, কেউ দেহ। কি, ভুল বলেছি ?

—না ভুল নয়। তবে ভীষণ বড় বড় কথা। মনে হয় বুঝি সত্যি।

—বড় কথা নয়। সব সত্যি, বিশ্বাস করুন। হঠাৎ চপলতার, দূরত্বের, ঔদাসীন্যের আবরণ যেন উড়ে গেল—সীতা কান্নায় ভেঙে পড়লো।—আপনি জানেন না, কী ভয়ংকর অবস্থায় আমি আছি। আমি আর সইতে পারছিনা, ভয় করে। কী হবে ?

অসিত অপ্রস্তুত বোধ করলো। উঠে কাছে গিয়ে হাতে হাত রাখলো। সীতা সেই হাত শক্ত ক'রে ধরলো। কাঁদলো। অসিত কিছু বললো না। বলতে পারলো না, এ হাত বড় দুর্বল। দূর থেকে সহানুভূতি হয়তো জানাতে পারে—নিশ্চিত আশ্বাস দিতে পারে না।

—সীতা, পাগলামি ক'রো না। ওঠো।

উঠলো, চোখ মুছলো, অনেকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলো সীতা।

—আজ চলি। অসিত অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে বলার চেষ্টা করলো, ডাক্তারের জন্য একজন উকিল ঠিক করতে হবে। তোমার কেউ জানা আছে ?

সীতা মাথা নাড়লো। অসিত, ভাল এবং সুস্থ থাকার উপদেশ দিয়ে বেরিয়ে এলো।

বাড়ীতে ফিরে, ঘরে বাচ্চা নিয়ে নারায়ণবাবুর স্ত্রীকে ব্যতিব্যস্ত দেখে, অসিত বিস্মিত হলো। শুনলো, রমা সন্ধ্যায় বেরিয়েছে। একটু পরেই ফিরবে ব'লে গেছে। তিন ঘণ্টা অবশ্য কেটে গেছে। কোথায় গেছে কে জানে। ভদ্র মহিলাকে বিরক্ত করার কোনও মানে হয় ?

মিনিট কুড়ি বাদে রমা ফিরলো, কিছু না বলে খেলো, বাচ্চাকে খাওয়ালো, ঘুম পাড়ালো। তারপর অসিতকে বললো,—আমি এক অ্যাডভোকেটের কাছে গিয়েছিলাম।

—তুমি ? কার কাছে ?

—আমাদের হাসপাতালের এক ডাক্তার ছিলেন। আমাকে খুব স্নেহ করতেন। তাঁর ছোট ভাই নাম করা একজন অ্যাডভোকেট। তিনিও আমাকে চেনেন। গিয়ে বললাম। রাজী হয়েছেন। কাল সকালে তুমি যাবে।

—আমাকে চিনবেন কি করে ?

—আমি চিঠি দেব। তুমি বলবে ডাক্তার তোমার বড় ভাই।

—সে কি ! ডাক্তার হচ্ছে চক্রবর্ত্তী আর আমি চৌধুরী।

রমা এই দিকটা ভাবে নি। হাসলো।

—তাও তো বটে। যাক গে, বলবে মামাতো ভাই। আমি ভাশুড় বলেছি যে।

—ব্যাপারটা সব বলেছ ?

—সব বলিনি। তুমি একটু গুছিয়ে বলো।

—বলতে হলে সত্যি কথাই বলতে হবে। সেটা কি আমাদের পক্ষে ভাল হবে ?

—সম্মানের কথা এখন ভেবোনা। লোকটা বিপদ থেকে উদ্ধার পাক—তার পর অনেক সময় পাবে।

অসিত শোবার জন্য উঠলো। বিরক্তিতে মন ভরে গেছে। ডাক্তারের ব্যাপারে রমার উদ্বেগের জন্য নয়—বিরক্তি, কাল আবার একটা নতুন মানুষের সংগে পরিচিত হতে হবে। কতগুলো কথা বলতে হবে। তার থেকেও বড় কথা, ডাক্তারের বিরুদ্ধে কি যে অভিযোগ তাই যে সে এখনো জানে না।

বিরক্তি, আপত্তি, অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক কাজ করতে হয় যা' স্বার্থ কিংবা লাভ-লোকসান দিয়ে বিচার করা যায় না। সকালে প্রথম অসিত থানায় গেল। অভিযোগ এবং তার ধারা নম্বর ইত্যাদি জানতে গেল। অ্যাড্ভোকেটের কাছে গিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা করলো। তিনিই যে কেসটা নিজে দেখাশোনা করবেন এই আশ্বাস রমাকে এসে জানালো।

ডাক্তার আজকেই বেলে ছাড়া পেতে পারে এই সম্ভাবনা যখন প্রবল হোল তখন সীতার খোঁজ নেবার অবকাশ জুটলো অসিতের। চারুদাও বাড়ী ছিল। বারান্দায় তুমুল উৎসাহে মাছ কোটা চলছিল, অসিতের উপস্থিতি কেউ টের পায় নি। বেশ ভাল লাগলো দেখে। দু জনের হৈচৈ, পরস্পরকে দোষ দেওয়া, অনভিজ্ঞতা নিয়ে ঠাট্টা, মাছের পেটে পিত্তের অবস্থান নিয়ে গবেষণা, পিত্ত গ'লে গেলে সমস্ত মাছটা তেতো হয় না শুধুমাত্র পেটের কাছটা—এই নিয়ে তর্ক, তিক্ত রস পেটের পক্ষে ভাল—যেমন উচ্ছে পলতা-নিম—অতএব পিত্ত পেটে গেলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও শুভপ্রদ—চারুদার ডাক্তারি জ্ঞানের প্রতি সীতার শ্রদ্ধাহীনতা,—ঘর থেকে বারান্দার দিকে তাকিয়ে অসিত যেন স্নিগ্ধতায় স্নাত হলো। অনেক রৌদ্রদগ্ধ দিনের শেষে বৃষ্টি যেন। একটি অবিশ্বাসী একক মেয়ে তার দাদাকে পেয়েছে, আরেকটি বিশ্বাসে নির্বোধ নিঃসঙ্গ মানুষ ছোট বোন পেয়েছে—ভাবতে অসিতের এত ভাল লাগলো যে নিজেকেই বিশ্বাস করতে তার ইচ্ছে হ'লো। সব কিছুর এমন সরল সহজ সমাধান হয় না কেন?

সীতার বারবার 'মেজদা তুমি ওঠো। কিছু জানো না তুমি। এবার ঠিক হাত কাটবে'—শুনে শুনে চারুদা অতিশয় ক্ষুণ্ণ ভংগীতে উঠলো। উঠেই অসিতকে দেখতে পেয়ে বললো, দেখেছিস? কাণ্ডখানা দেখলি?

বলি না, রাজনীতি করলে মাতব্বরী বাড়ে? তিন বছর নিজে রেঁধে খাচ্ছি—আমি নাকি মাছই কোনদিন চোখে দেখিনি।

সীতা দেখে হাসলো। সুন্দরী নয়, কিন্তু হাসিটা বড় মিষ্টি মনে হলো। বললো,—তিনবছর যে কী খেয়েছ সে তো বুঝতেই পারছি। আজ খেয়ে যাবেন। মেজদা, খেয়ে যেতে বলো।

—বলবো কি। ওতো খাবেই, ব'লে চারুদা তেলের শিশি, কেরাসিনের টিন, ছোট একটা কৌটা নিয়ে বার হলো।

—আশ্চর্য লোক। সীতা বললো, কোন কিছুকে আমলই দেয় না। বলে কি জানেন? দুঃখ ভাবলেই দুঃখ। সুখের জন্য চেষ্টা করবি না, দেখবি, দুঃখও নেই।

—চারুদা চিরকালই অমনি। খেতে পারে খুব, খায়ও—কিন্তু জোটে না সব সময়ে। তুমি আর কোথাও যেও না। চারুদার কাছেই থেকে যাও—লোকটা খেয়ে বাঁচবে। তুমি থাকলে ছেলেটাকে চারুদা নিয়েও আসতে পারে।

—আমিও ভেবেছি। কিন্তু তা হবার নয়।

—কেন?

—কি হবে এই ভাল মানুষটাকে জ্বালিয়ে?

—কি হবে মানে? সুখ না থাক শান্তিতে থাকতে পারবে।

—বাজে কথা। সুখ আর শান্তি কি আলাদা? কাল কাগজে দেখলাম, এক বড় অফিসার তেরোতলা বাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়েছে দেখেছেন? আপনি কি বলেন, লোকটার সুখ ছিল, শান্তি ছিল না? নাকি, শান্তি ছিল, সুখ ছিল না? অসুখ হ'লে কোনটাই থাকে না। আমারও অসুখ।

একটু আগের অনুভূতি সীতার কথায় চির খেয়ে গেল। এই প্রসংগ বিরক্তিকর লাগে। তর্ক করতে ইচ্ছে নেই, তবু অসিত বললো, এ জীবন তোমার ভাল লাগে না?

—ভাল নিশ্চয়ই, তবে আমার জন্যে নয়। আমার রক্তের মধ্যে যে অশান্তি আছে, লজ্জা আছে, অপমান আছে। এত অসুখ কি টোটকায় সারে?

—তা হলে মুষ্টিযোগ দরকার। অসিত রেগে গিয়ে বললো, আমার জন্যে কিছু কোরো না—আমি কিন্তু খাব না।

—কেন ?

—অনেক কাজ আছে। এক্ষুনি অ্যাড্ভোকেটের কাছে যেতে হবে। বেল পিটিশন করা হয়েছে—আজ তার শুনানী। বোধহয় ডাক্তার আজ ছাড়া পাবে।

—উকিল ঠিক হয়ে গেছে ?

—হুঁ। রমা ঠিক করেছে।

—রমাদি ?

অস্বস্তিজনক স্তব্ধতা ভাঙবার জন্য অসিত কথা হাতড়ে বেড়ালো—পেলো না।

সীতা বললো, ডাক্তার জেলে থাকলেই ভাল হোত।

—কেন ? অসিতের জিজ্ঞাসার মধ্যে রুক্ষতা ছিল। সীতা তাকালো।

—না, আমি অন্য কিছু বলতে চাইছি না। বলছিলাম, ডাক্তারের জন্য আরো দুঃসংবাদ রয়েছে। বেরিয়েই সেটা তাকে পেতে হবে।

—কি দুঃসংবাদ ?

—ডাক্তারের টাকাকড়ি যে ব্যাংকে ছিল—সেই ব্যাংক ফেল পড়েছে।

—এই যে কদিন আগে একটা ব্যাংকের কথা কাগজে লিখছিল ?

—সেটাই।

—ছোট ব্যাংক তো, ওখানে রাখতে গিয়েছিল কেন ?

—বেআইনী রোজগার, ট্যাক্সের ঝামেলা আছে—তা ছাড়া ঐ ব্যাংকের কর্তা ডাক্তার বাবুর পরিচিত। ছদ্মনামে রাখার সুবিধা ছিল। সীতা হাসলো, আমারও কিছু গেছে। সামান্য—হাজার দুয়েক। অবশ্য ওটুকুই সম্বল ছিল।

—কিছু বলো নি তো।

—কি বলবো ? বলে কি হবে ? আমার জন্য ভাবি না—তবে ডাক্তারবাবু একেবারেই শেষ হ'য়ে গেল।

—কত ছিল ?

—তা জানি না। তবে যা ছিল, সব ওখানেই ছিল।

অসিত মুখ নীচু ক'রে রইলো। টাকাই সব নয়—ভাবতো যখন হাতে, বেশ কিছু না হ'লেও, টাকা থাকতো। জীবনের অনেকটাই টাকা যখন হাড়ে হাড়ে টের পেল, তখন হাত শূন্য। তাই অসিত ভাবতে পারলো না, ব্যাংক ফেল পড়লে কি হয়। সীতা বললো,

—একটা সুবিধা ছিল, টাকা না থাকলে ডাক্তারের কাছ থেকে পাওয়া যেত। এখন সেটা যাবে না।

—চলি।

—তাড়াতাড়ি মাছ ভেজে দি ? এক্ষুনি হ'য়ে যাবে।

—না থাক। সময় হবে না।

—রাত্রে আসবেন ?

—বলতে পারছি না। আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো না' হঠাৎ চলে আসার জন্য লজ্জিত হলেও অসিত মনে করলো ঃ উপায় নেই। অনেক কাজ আছে।

অনেক কাজ ঃ কথাটা কেমন তৈরী করা মনে হয়। সময় কাটাতে হবে, তাই কাজ। নিজেকে জাহির করতে হবে, তাই আদর্শ। সুখ পেতে হবে, তাই রাজ্যের ঝামেলা ঘাড়ে নেওয়া। একটু ভাবলেই যেহেতু সব কিছু অর্থহীন মনে হয়, তাই অসিত ভাবনা ছেড়েছে। ভাবনা ছেড়েও, সব কিছুর মধ্যে অর্থ খুঁজতে গিয়েও, ডাক্তার যখন কোর্ট থেকে আবার ফেরৎ যাবার সম্ভাবনা নিয়ে বেরিয়ে এলো—অসিত দেখা করতে পারলো না। যদি ডাক্তার লজ্জিত হয়।

সারাদিন অস্নাত, অভুক্ত অসিত শুধু কাজ করেছে। অনেক কাজ। রমাকে রাত্রে ক্লান্তির কথা বললো না, ডাক্তারের কথা বললো।

—পার্সোনাল বণ্ডে ছেড়েছে, কিন্তু বুঝলাম না সেটা কার। ডাক্তারের, না অ্যাডভোকেটের। ডাক্তারের হ'লে তো বিপদ।

—কেন ?

—ডাক্তারের তো কিছুই আর নেই। ব্যাংক ফেল পড়েছে।

—তাই নাকি ? কোন ব্যাংক ?

—বাজে একটা ব্যাংক। কিছুদিন আগে খুব হৈ চৈ হলো, মনে নেই?

—কত ছিল?

—কে জানে।

—আমাদের কর্তব্য আমরা করেছি, রমা নির্লিপ্ত স্বরে বললো, এখন ডাক্তার বুঝুক। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছ?

—দেখা করিনি। কাল একবার যাবো ভাবছি।

—না, না। যেতে হবে না। গিয়ে কি হবে?

—একটা কর্তব্য আছে তো।

—যথেষ্ট করেছ। আর দরকার কি?

রমার দরকার নেই, আসতের দরকার নেই—কিন্তু অন্যত্র দরকার গ'ড়ে ওঠে। সেই সম্ভাবনার কথা মনে থাকে না বলে সেই দরকারের দাবী যখন এসে হাজির হয়—তখন ব্যাখ্যায় আর কূল পাওয়া যায় না।

পরদিন রাত্রে বাড়ী ফিরে অসিত বারান্দায় একটু থমকে দাঁড়ালো। রমার ঘরে কথার আওয়াজ। কেউ এসেছে। কান পেতে শুনলো, ভারী গলার স্বর, ডাক্তারের। ঢুকবে, কি ঢুকবে না ভাবলো। কিন্তু এই অন্ধকারে অপরের কথা শোনা আরও খারাপ, ঘরে না ঢোকা লজ্জা-জনক—ভেবে অসিত একটু সময় দিয়ে শব্দ করে ঢুকলো।

রমা বিছানায়, ডাক্তার একটা মোড়ায়। দুজনে তাকালো। অসিত অপ্রস্তুত হয়ে হাসবার চেষ্টা করলো। অন্য দুজন সে চেষ্টা করলো না। ডাক্তারকে দেখে অসিতের একটা বিরাট ভাঙা বাড়ীর কথা মনে পড়লো। কোন এক ছোট্ট ষ্টেশনের গায়ে বাড়ীটা দেখেছিল। বড় বড় থাম-ওয়ালা বিরাট বাড়ীটা ফাঁকা, জীর্ণ, কালো। সারা দেওয়ালে শ্যাওলা। ফাটা কার্ণিশে গাছ। খোলা জানালা দিয়ে আকাশ দেখেছিল। বাড়ীটা বড় বলেই যেন তার ভগ্ন, অসহায় একাকীত্ব ভয়ংকর বিরাট হ'য়ে উঠেছিল। ডাক্তারের ময়লা ধুতি, বেখাপ্পা হাওয়াই সার্ট, বিরাট দেহ—কেমন হাস্যকর করুণ মনে হোল।

—কেমন আছেন? ডাক্তার ধীরে ধীরে বললেন।

—আপনি কি অসুস্থ?

—না। ডাক্তারের মাথা নাড়ার মধ্যে অধীরতা। রমা নির্বাক। বাচ্চার পরিচর্য্যায় ব্যস্ত।

—আছেন কোথায় ?

—কোথাও না।

—কেন, আপনার বাড়ী ?

—আছে, উঠিনি।

—তবে কোথায় উঠেছেন ?

—বললাম তো। বিরক্ত স্বরে ডাক্তার বললেন।

—এ সময়ে আপনার একটা নির্দিষ্ট ঠিকানায় থাকা দরকার।

—নির্দিষ্ট ঠিকানা ? ডাক্তার যেন কথাটার অর্থ বোঝবার চেষ্টা করলেন, কেন !

—বেলে ছাড়া পেয়েছেন. কোর্ট যখন ডাকবে তক্ষুনি যেতে হবে। না গেলে আপনার যিনি জামিন হয়েছেন, তিনি বিপদে পড়বেন।

—বিপদে পড়বেন ?

—পড়বেন না ?

ডাক্তার কথা শুনছেন বলে মনে হোল না। তাঁর দৃষ্টি অত্যন্ত চঞ্চল। কাপড়ের খুঁট বারবার টান টান করছেন।

—আমাকে থাকতে দেবেন ?

ডাক্তারের প্রশ্নে অসিত বিমূঢ়। পরিষ্কার করবার জন্য জিজ্ঞাসা করলো। মানে, আপনি এখানে থাকতে চাইছেন ?

ডাক্তার অন্য দিকে তাকিয়ে নিরুত্তর। রমার চিন্তিত মুখ দেখলে বোঝা যায় সেও বিস্মিত। অসিত কুণ্ঠিত স্বরে বললো, এই ছোট্ট জায়গায় কি থাকা সম্ভব হবে ? আমাদেরই কুলোয় না।

—কুলোয় না ? কুলিয়ে যাবে ঠিক।

—তা ছাড়া এখানে থাকা উচিত হবে না।

—থাকুক না। রমা মৃদুস্বরে বললো, কুলিয়ে যাবে।

ডাক্তার সামান্য দুলে দুলে বললেন, কত খাবো ? ভাত, না রুটি ?

—খাবেন ? রমা, কিছু আছে ?

রমা উত্তর দেবার আগেই ডাক্তার বললেন, বিষ ? অনেকেই আমার

পেছনে ঘুরছে। আমি জানি, ঘুরছে। অসিতবাবু, কেমন আছেন ?

—ভালই আছি। অসিত কেমন বেকুবের মত উত্তর দিল।

—ভাল আছি। আমি আছি, তুমি আছ, সবাই আছি। সবাই আছি। সবাই—আছি না আছেন ? ডাক্তার হেসে নিজের বুকে একটা ঘুষি মেরে বললেন, ষ্টিলের হার্ট। ভাল আছি। উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। —ভাল আছি। কিন্তু কোথায় আছি ? কোথাও না। কটা বাজলো কে জানে। বেরিয়ে যেতে যেতে ডাক্তার কর্কশ স্বরে বললো, পেছনে ঘুরছো ? মারবে ? ভাল আছি।

ভীত বিস্মিত চোখে রমা অসিত তুজনের দিকে চাইলো।

অসিত বললো, ব্যাপার কি ?

—কি জানি। অনেকক্ষণ এসেছে, বেশী কথা না ব'লে বসেছিল, মাঝে মাঝে বলছিল—ভয় করে কেন ? ক্ষিধে পায় তোমার ? এখানে থাকবো। আরও সব—কি হলো ?

বাইরে ভারী কিছু পড়বার শব্দ শুনে অসিত ছুটে বাইরে এলো। বারান্দার নীচে, সিঁড়ি আর উঠোন জুড়ে ডাক্তার পড়ে রয়েছে। অজ্ঞান।

—রমা, শীগ্‌গির এসো।

রমা এলো। দেখেই, চৌবাচ্চা থেকে এক বালতি জল এনে, সমস্ত শরীর ভিজিয়ে, মাথায় জল দিল। বেকায়দায় শোওয়া অতবড় দেহটা কায়দা ক'রে সমান জায়গায় শোওয়াল। রমা সুদক্ষ নার্স—একথা সব সময় মনে থাকে না।

—কী ফ্যাসাদ বলো তো ! এখন এঁকে পৌছাই কি ক'রে ?

—কোথায় পৌছবে ?

—বাড়ীতে।

—ওখানে ওঠে নি।

—তাও তো বটে। তবে ?

—সুস্থ হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকুক।

—কিন্তু ব্যাপারটা কি ? মাথার কি কোনো— ?

—তাই মনে হচ্ছে। জ্ঞান ফিরেছে। পিঠের তলায় জল গেছে কি না দেখ তো। যায় নি তো ? আলোয়ানটা ভাল ক'রে গায়ে জড়িয়ে দাও।

ডাক্তার তাকালেন কিনা বোঝা যায় না অন্ধকারে। পাশ ফেরবার চেষ্টা করলেন, বিড় বিড় করে কি বললেন।

—কিছু বলছেন? অসিত কাছে মুখ নিয়েও কিছু বুঝতে পারলো না। বললো, উঠুন, ঘরে চলুন।

রমা দ্রুত অসিতের ঘরে শোবার ব্যবস্থা করলো। অসিতের বিছানা নিজের ঘরে নিয়ে এলো। বললো,—ধরে নিয়ে এসো। আবার পড়ে না যায়।

ডাক্তার শান্ত ছেলের মত উঠলেন, ঘরে গেলেন। রমার কথায় শুয়ে পড়লেন। নির্বাক। স্থির দৃষ্টি ওপরে ছড়ানো। রমা মাথার কাছে ব'সে হাওয়া করতে করতে বললো,—তুমি খেয়ে নাও গে'। আমি আছি।

বিপর্যস্ত মনে খাবার ইচ্ছে থাকে না। অসিত ভাত নাড়াচাড়া ক'রে চলে এলো। রমা উঠে ভাত নিয়ে এলো। ডাক্তারকে বললো,

—ওঠো। এটুকু খেয়ে নাও।

ডাক্তার উঠলেন। থালার সামনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। অনেকক্ষণ। রমা, অসিত দুজনেই খাবার জন্য অনুরোধ করলো। ফল হলো না। হঠাৎ ডাক্তার অসিতের দিকে কটমট ক'রে একবার তাকালেন। জড়ানো স্বরে যা' বললেন তার মধ্যে শুধু বিষ কথাটা বোঝা গেল। থালাটা উল্টে দিয়ে জল ঢেলে উঠে পড়লেন। তাঁকে দরজার দিকে যেতে দেখে রমা ছুটে কাছে গেল।

—যাচ্ছ কোথায়? শুয়ে পড়।

ডাক্তার অসিতের দিকে তাকিয়ে কি বললেন। রমা বললো, কেউ কিছু বলবে না। তুমি এসো।

ডাক্তার শান্ত হ'য়ে ফের খাটে এসে শুলেন। রমা নোংরা মেঝে পরিষ্কার করলো।

অসিত বললো,—তুমি কি খাবে?

—দরকার হবে না। তুমি গিয়ে শোও—আমি একে ঘুম পাড়িয়ে আসছি। বাচ্চাটাকে একটু দেখো।

অসিত চ'লে এলো এঘরে, এবং ওঘরে ডাক্তারের উচ্চকণ্ঠ, রমার মৃদু কথা শুনতে শুনতে কখন যেন আর শুনতে পেলো না।

সকালে ঘুম ভাঙলো পাশের ঘরের শব্দে। খাট টানা, জিনিষ ছুঁড়ে ফেলা, দরজা ধাক্কানোর প্রচণ্ড শব্দ। প্রথমে কিছু বুঝতে পারে না অসিত। রমার ঘরে নিজেকে দেখে মনে পড়লো। রমাও বিছানায় উঠে বসেছে।

—এত শব্দ কিসের ?

—বাইরে থেকে দরজা বন্ধ ক'রে রেখেছি ব'লে বোধ হয় ভয় পেয়ে গেছে।

—ভয় না ছাই। যতো সব ইয়ে। মহা বিরক্ত হ'য়ে অসিত উঠলো।

—তুমি কি ওঘরে যাচ্ছো ? বাচ্চাটাকে কোলে নিতে নিতে রমা বললো, একটু সাবধানে দরজা খুলো।

কোন উত্তর না দিয়ে অসিত বাইরে এলো। আকাশ শীতে স্থির। আলো স্পষ্ট নয়। মাঝে মাঝেই ডাক্তার দরজা ধাক্কাচ্ছেন, চেঁচিয়ে গালাগাল দিচ্ছেন। অসিত দরজা খুলতেই ডাক্তার ছুটে ঘরের কোণে চলে গেলেন। জামা কাপড় অবিন্যস্ত। উত্তেজনায়, ভয়ে, পরিশ্রমে চেহারাটাই অন্য রকম হয়ে গেছে। বাচ্চারা যেমন যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলে, তেমনি 'কাম-অন-ফাইট' ভংগীতে ঘুষি পাকিয়ে ভয়ার্ত, সন্ত্রস্ত ডাক্তার দাঁড়িয়ে। অন্ধকার ভোরে সদ্য ঘুম ভাঙা-চোখে অতবড় লোকটাকে এমন ভংগীতে দেখে অসিতের হাসি পেল। ভয়ও লাগে, আড়চোখে ডাক্তারের দিকে নজর রেখে অসিত পেষ্ট-ব্রাশ নিল, দরজার কাছে এসে বললো, ডাক্তার বাবু।

ডাক্তার ভীষণ চমকে উঠলেন। গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে বললেন,

—কে ? কে কথা বলে ?

অসিতের সন্দেহ হোল, চোখেও দেখতে পাচ্ছেন না নাকি।

—আমি অসিত।

—কে ? বেরোও শালা। মেরে ফেলবো। মেরে ফেলবো কিন্তু।

বিনা বাক্যব্যয়ে অসিত বেরিয়ে যাচ্ছিল, রমা ঘরে ঢুকলো। ডাক্তারের হাত ধরে বললো, কি হচ্ছে এসব ? শুয়ে পড়ো। তুমি খুব অসুস্থ—কক্ষনো উঠবে না।

—উঠবো না ? শুয়ে থাকবো ? ডাক্তার খাটে শুয়ে বললেন, অসুস্থ ?

বারবার অসুস্থ কথাটা আবৃত্তি করলেন।

তারপর সারাদিন রমা বাচ্চা আর ডাক্তার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইল। হৈ চৈ শুনে নারায়ণবাবু এলেন, তাঁর স্ত্রী এলেন। আশপাশের আরও দু'চারজন এলো। দেখে সবাই মুখে ক্ষোভ সূচক শব্দ করলো, মাথা নাড়লো, সহানুভূতি প্রকাশ করলো। ডাক্তারের বিরাট শরীরের কাছে কেউ গেল না, দূর থেকে রমাকে উপদেশ দিল। সেদিনের পর থেকে আর কেউ এলো না, নারায়ণ সামন্ত ছাড়া।

সীতাকে যখন অসিত সব কথা বললো, তার মুখে বিস্ময়, বেদনা, সহানুভূতির কোন চিহ্নই প্রকাশ পেল না। একটু স্তব্ধ থেকে বললো,

—ডাক্তারবাবু পাগল হয়ে গেলেন ?

—যেন ভয়ানক ভয় পেয়েছেন মনে হয়। কেউ কাছে গেলেই আঁতকে ওঠেন। একমাত্র রমাই তাঁকে ম্যানেজ করতে পারছে।

—রমাদিকে চিনতে পারছেন ?

—তা তো বুঝি না। রমার কথাই শুনছেন, ফলে রমার খাটুনি বেড়ে গেছে খুব।

—রমাদি খুব সেবা করছেন, না ?

অসিত সে কথার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞসা করলো, তুমি একবার দেখতে যাবে ?

—না।

হঠাৎ সমস্ত কথা যেন ফুরিয়ে গেল দুজনের। সম্পূর্ণ বিপরীত কারণে দুজন অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল।

সীতা হাসলো।

—কী অদ্ভুত, না ?

—কী ?

—রমাদি ডাক্তারকে সবচেয়ে বেশী ভয় করতো, এখন প্রাণপণ তারই সেবা করছে। এখন ভয় করে না ?

—কি জানি।

—আপনি কিছুই বোঝেন না। শত হোক ডাক্তারের সংগেই

রমাদির অগ্নি-সাক্ষী করে বিয়ে হয়েছিল—সে কথা রমাদি কোন দিন ভুলতে পারে না।

—তা বোধ হয়—নয়।

—নয়? সীতা তীক্ষ্ণস্বরে হাসলো, যে কোন একটা পাগলের জন্যে কারো অত করুণা হয়? আপনি ভুল করছেন।

—ভুল করছি?

—নয় তো কি! সবাইকে নিজের কল্পনা মত বিচার করেন—ফলে ভুল হয়, আর আঘাত খান। ও সব আদর্শ-টাদর্শ বাদ দিন—নতুন ক'রে জীবন সুরু করুন, সবাইকে নিজের মত চলতে দিন—দেখবেন, অনেক শান্তি ওতে। রমাদিকে আপনি আটকাতে পারবেন?

হঠাৎ বড় ভয় করে অসিতের। সত্যি কি ভুল? সবাইকে সবার মত করে দেখতে গিয়ে হয়তো সত্যিই সবার মনগড়া কল্পনার রূপই দেখেছে অসিত। কথার ওপরেও কোন মানে আছে, এক আচরণের অন্তরে অন্যতর কোন উদ্দেশ্য আছে—অসিত তা জানে না। রমা সত্যি দুর্বোধ্য, মনে হোল: অন্য কেউ, সে আরেকজন হয়তো।

—কি হয়েছে? সীতার কোমল প্রশ্নে অসিত কপাল থেকে হাত সরালো।

—মাথাটা ধরেছে। ভাল ঘুম হয় না তো।

—মাথা টিপে দেবো?

সীতা কাছে এসে কপালে হাত বুলিয়ে দিল, আস্তে আস্তে চুল টানলো, ঘাড়ের কাছটা অল্প আঘাত করলো। আরামে ঘুম পায়। চোখ বুঁজলো অসিত। ভাল লাগলো। কোথাও কোন অজ্ঞাত বেদনা রয়ে গেছে, স্নিগ্ধতার স্পর্শে সেই বেদনাই জেগে ওঠে। তবু ভালো লাগে। সেই বেদনা, সেই স্পর্শ সমান হয়ে ওঠে।

চুলে বিলি কাটতে কাটতে সীতা ফিসফিস করে বললো,

—ডাক্তারের কথা ভাবলে নিজের জন্য বড় ভয় করে। সত্যি, আজকাল বড্ড ভয় করে আমার।

—কিসের ভয়?

—শূন্যতার। আমার অস্তিত্বের তো কোন মানেই হয় না। সত্যি, ভাবুন, এই বাইশটা বছর কি জন্যে আছি ?

—কি জন্যে থাকতে চাও ? অসিত মৃদু হাসলো।

—জানি না। হয়তো কেউই জানে না। তবুতো মানে খুঁজে নিতে হয়—সত্য মিথ্যা যাই হোক, সেই মনগড়া মানে নিয়েই তো মানুষ বাঁচে। আমার কি আছে ?

—অত হতাশ হলে চলে ?

—আশা থাকলে হতাশা আসে। আমি হতাশ নই। কত রকম কাজ করেছি—অন্যেরা ন্যায়-অন্যায় বিচার করে—আমি করি না। যা ইচ্ছে আঁকড়ে ধরেছি, আঘাত করেছি, আঘাত খেয়েছি। মানে খুঁজে না পেয়ে নিজেকে করুণা করেছি, অন্য মানে খুঁজেছি। অন্য অনেকে আমার চঞ্চলতার সুযোগ নিয়েছে—বাধা দিই নি। কিন্তু শূন্যতাকে এড়াবো কি করে ?

অন্ধকারে অসিত সীতার হাত ধরলো। সীতা কি কাঁদছে ? বোধ হয় না। উষ্ণ নিশ্বাস কপালে অনুভব করলো। চেতনা আচ্ছন্ন হবার আগেই অসিত উঠলো।

—আলোটা জ্বালি কেমন ?

আলো জ্বেলে অসিত হাসলো। সীতাও।

—মাথাব্যথা একদম চলে গেছে। অসিত বললো, তুমি তো মাথা টিপেই অনেক রোজগার করতে পারো। ব্যথা-ওলা মাথার তো অভাব নেই।

—তাই করবো। চললেন ?

—যাই।

—সীতা হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠলো বনিময় করবেন ?

—মানে ?

—ডাক্তার ভাল হলে আপনার ছেলে সে মানুষ করবে—আপনি তার সন্তানের দায়িত্ব নিন না।

—তার আবার সন্তান কোথায় ?

—আজ নেই, হতে তো পারে।

—কিই যে বলো। তুমিও ডাক্তারের পথ ধরলে নাকি? দেখো বাবা ডাক্তারের জন্য রমা আছে—আমি কিন্তু তোমার সেবা করতে পারবো না।

—করতে হবেও না। মেজদা আছে সে জন্য।

—তা' বটে। এদিক থেকে ডাক্তারের চেয়ে তুমি ভাগ্যবতী।

বাইরে এসে অসিত দেখলো শীত, ধোঁয়া, ম্লান আলো। বাড়ীতে দেখলো রমা উপুর হয়ে কি যেন লিখছে। প্রায়ই লিখতে দেখে, কি লেখে এত—অসিত জানতে চায় না। আজও চাইলো না। জিজ্ঞাসা করলো,

—ডাক্তারবাবু কেমন?

—ঘুমোচ্ছে।

—এখন?

—সন্ধ্যায় এক ডাক্তার এনেছিলাম। ঘুমের ওষুধ দিয়ে গেছে।

—আচ্ছা, তুমি এত চালাচ্ছো কি করে? রোজ ডাল-ভাত-তরকারী তো জোটেই দেখছি।

রমা হাসলো। উত্তর দিল না।

খাবার সময় রমা বললো, চারুদা এসেছিল।

—কি বললো?

—আচ্ছা সীতা কে? চারুদা বললো, কে এক রাজনৈতিক কর্মী, লুকিয়ে আছে। কে মেয়েটি? কোনো দিন তো বলোনি।

খেতে খেতে অসিত ভাবলো। সত্য মিথ্যার দায় নেই, অতএব সত্যিকথা বললো না।

—পার্টির একটি মেয়ে, তুমি চেন না।

—আবার রাজনীতি করছো?

অসিত ভাবলো, করতে পারলে ভাল হতো। সময় কাটতো। পার্টি-ওলারা কিন্তু অত বোকা নয়। তারা সবাইকে অভয় দেয়—ভীত কর্মী নিয়ে কাজ করে না।

—না, রাজনীতি করবার সময় কোথায়? চিরকাল তুমি এমনি করে চালাবে নাকি? আমায় চাকরী করতে হবে না?

—কোন খোঁজ পেলে? নিস্পৃহ কণ্ঠে রমা বললো।

ঠাট্টা নয়, তবু অসিতের মনে হোল, যেন সেই সুর কিছুটা রয়ে

গেছে। তাই সেদিক দিয়ে আর গেল না বললো, ডাক্তারকে তোমার ভয় করে না ?

—ও কি আর এখন মানুষ আছে। ভয় করবে কেন ?

—পাগলকে ভয় করো না ? দারুণ সাহস তো।

—আমি নার্স, অসুস্থকে ভয় করলে চলে ?

অসিত উঠতে উঠতে বললেন, তুমি যে নার্স—এ কথাটা মনে থাকে না।

কোন ঘটনা যখন ঘটে, প্রথমে তা' বড় নতুন মনে হয়। চমক লাগে। তারপর ক্রমাগত দিন রাত্রির ঘষায় ঘষায় তার ঔজ্জ্বল্য ম্লান হ'য়ে আসে। এক ঘেয়ে, গতানুগতিকতার ক্লান্তিতে সেই ঘটনার শেষের কথাও আর মনে পড়ে না। সাতদিনে ডাক্তার অনেক সুস্থ হয়ে উঠেছেন। সেই তীব্রতা আর নেই, কেমন ম্লান স্তব্ধ হয়ে গেছেন। কোন কথা বলেন না, কথা বোঝেন কি না বোঝা যায় না। আগে অসিতকে দেখলে ক্ষেপে উঠতেন, আজকাল অচঞ্চল উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।

অসিত বাড়ী থাকে না, চারুদার কাছে যায় না। সীতার কাছেও যায় নি কয়েক দিন। ভাল লাগে না। কিছু ভাল লাগে না। যেন কর্ত্তব্যের খাতিরেই বাড়ী ফেরে। রমা একটা না একটা কাজে ব্যস্ত থাকে। হয় বাচ্চা খাওয়ায়, নয় ডাক্তারের বিছানা করে, ওষুধ খাওয়ায়, জামা কাপড় কাচে। অসিত একদিন বললো—এত খাটো কেন ? শরীর আবার ভাঙবে। রমা হেসে বলেছিল, খাটলে আমার শরীর খারাপ হয় কোন দিন দেখেছ ? অসিত বোঝে না, এত শক্তি রমা পায় কোত্থেকে। বাড়ী ফিরলে নিজেকে আগন্তুক মনে হয়, পথে অজস্র অপরিচিতের স্রোতে নিজেকে অচেনা লাগে। সন্দেহ সে কাউকেই করে না—কিন্তু তার অবচেতন সবুজ আভায় মন আচ্ছন্ন হয়, অনুভব ক'রে পীড়িত বোধ করে।

বোধ হয় রেহাই নেই, বোধ হয় এড়ানো যায় না, বোধ হয় সীতার কথাই সত্যি। সীতা কি ভালবাসে, না করুণা করে ? কে জানে।

দেহের জন্য লোভ হয়, ভাবলে অপরাধী মনে হয়। ক্লান্তি লাগে। কোথায় যে এর শেষ, এই দোলনার সাম্য—জানে না অসিত। ডাক্তার কবে যাবে? সীতার কি হবে? রমা?

ক্লান্তি আসে। সত্যি, বোধহীন ক্লান্তি আসে। ভাল লাগবে, সময় কাটবে—এই আশায় কাল সীতার কাছে গিয়েছিল।

ঘরে আলো জ্বলছিল, অসিত যেতে সীতা নিভিয়ে দিল।

—নেভালে কেন?

—কেন, আমাকে অবিশ্বাস?

—সে কথা নয়। অন্য লোকেরা কি ভাববে?

—ভাবুক। তাতে আমার কি?

—তোমার কিছু নয়? অসিত হেসেই বললো, সম্মান?

—সম্মানের জন্য দুর্ভাবনা আমার নেই। সম্মানই নেই আমার।

—তুমি সৌভাগ্যবতী। সাধনায় অনেকদূর এগিয়েছো।

সীতা কি যেন ভাবলো। রুক্ষস্বরে বললো, তুমিতো সবার অনেক উপকার করে বেড়াও—আমার একটা উপকার করবে?

অসিত সম্বোধন শুনে চমকে গেল। প্রশ্নের ভঙ্গীতে ঘাবড়ালো, উত্তর দিতে পারলো না। সীতা কাছে এলো, অনেক কাছে। চেয়ারের হাতলে রাখা অসিতের হাত ধরলো। বললো, একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখবো। সাহায্য করবে তুমি?

—কিসের চেষ্টা? পরীক্ষা দেবে? সে তো ভাল কথা।

—না। তীব্রস্বরে সীতা অসিতকে চমকে দিল, রমাদি তোমাকে আর চায় না, একথা স্বীকার করতে ভয় পাও কেন? স্বীকার করো যে তুমি কাউকে চিনতে পারোনা। তোমার সব ধারণাই ভুল।

—তাতে লাভ?

—লাভ আমার। আমাকে তাহ'লে মিথ্যে নিয়ে থাকতে হয় না।

—তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না।

—তুমি বোঝ না। কিছু বুঝতে চাওনা তুমি। কেন? কেন?

হঠাৎ সীতা কেঁদে ফেললো। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলো। কাঁদবার সময় দিল অসিত। বিরক্ত লাগে। ধমকাতে ইচ্ছে ক'রে। তবু

অসিত চুপ ক'রে কান্নার শব্দ শুনলো। ভাবলো মিথ্যের সঙ্গে প্রেম করলে কান্না কোনদিনই শেষ হবে না। আজ সত্যি কথা বলতে হবে। এ খেলা শেষ হোক। আর ভাল লাগে না। অসিত নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বললো, শোন সীতা। তোমাকে, তোমার যন্ত্রণাকে চিনতে চেয়েছি তোমার সম্পূর্ণতায়, তাকে কান্নার জলে খণ্ডিত করো না।

—ছিঃ এখনও মিথ্যে কথা বলছো? সীতা দু'হাতে অসিতের মুখ তুলে ধরলো। অন্ধকারে নিঃশ্বাসে, চুলের ছোঁওয়ায়, হাতের উষ্ণতায় গা শিরশির করলো অসিতের। সীতা বললো, আমার যন্ত্রণাকে চিনতে চাও—কিন্তু যে দেহ ঘিরে এই যন্ত্রণা, তাকে চিনবে না?

—কি চাও তুমি?

—তোমাকে চাই। সীতা অনুনয়ে ভেঙে পড়লো, আমাকে তুমি নাও। সম্মান দাও বা না দাও—একটু এ জীবনের মানে বুঝতে দাও।

অসহ্য! অসিত উঠলো। অন্ধকারে সীতা স'রে গেল।

—ন্যাকামী কোরো না, সীতা। তুমি জানো তা' সম্ভব নয়। আজ চলি। পরে, কাল-পরশু আবার আসবো।

অসিত দ্রুত নয়, ধীরে ধীরে, বেরিয়ে এলো। সীতা অন্ধকার ঘরেই রয়ে গেল।

ভাল লাগে না। সময় কাটে না। সময় কি চলে? সীতা নির্বোধ। অসিত বোধহীন। রমা দুর্বোধ্য। ডাক্তারকে বোঝা যায়, কারণ সে উন্মাদ। উন্মাদ? না আত্মরক্ষার কৌশল? সন্দেহের পান্না আভায় অসিত অসুস্থ। কাল'সীতাকে সত্যের অন্ধকারে রেখে এসে ক্ষোভ নেই। সে ছলনা করতে চেয়েছে। রমার শান্ত ভংগীতে ছলনা। পরোপকারী নারায়ণ সামন্তের আচরণে ছলনা। ডাক্তারের উন্মাদনায় ছলনা।

নিজেকে অসিতের সন্দেহ হয়। ডাক্তার স্তব্ধ। কোন কথা বলেন না সারাদিন। শুধু প্রশ্ন করলে হ্যাঁ না জবাব দেন মাথা নেড়ে। অনেক ভাল হয়ে গেছেন। ডাক্তার বাবু, যিনি দেখেছেন, আশ্বাস দিয়েছেন আর দু'চার দিনের মধ্যেই শক্ কেটে যাবে।

কিন্তু সকালেই এক বিপত্তি। চা খেতে খেতে হঠাৎ চীৎকার ক'রে

ডাক্তার অজ্ঞান হয়ে গেলেন। জামা কাপড়ে, বিছানায় চা ছড়িয়ে গেল। অসিত আর রমা তুজনেই ছুটে গেল। মাথায় জল ঢালা হলো, শুকনো লংকা পুড়িয়ে শোঁকান হলো, আরো নানান কায়দা করা হলো —জ্ঞান ফিরলো না তবু। রমা বললো, তুমি পা তুটো কম্বল দিয়ে ঘষো। আমি মাথায় জল দি'।

—কী উৎপাত যে জুটেছে। অসিত পা ঘষতে ঘষতে বললো, এই লোকটার জন্য তোমার এত করুণার অর্থ কি বলতো ?

রমা ম্লান হাসলো। তোমাদের সন্দেহ হচ্ছে ?

সকালবেলার শীতেও অসিতের গা জ্বালা করে।

—সন্দেহ আবার কি ! কোন দিন কারোর কথায় সন্দেহ করিনি ব'লেই তো এই অবস্থা।

ওঘরে বাচ্চাটা কেঁদে উঠলো। আজকাল গলার কী জোর হয়েছে ছেলেটার। রমা বললো, তুমি একটু যাওনা। আমি একে দেখছি।

—আমি এর সেবা করতে পারবো। মেরে ফেলবো না। তুমি যাও।

রমা একটু বিস্মিত হ'য়ে তাকালো। কিছু বললো না। চলে গেল।

দৈত্যের মত অচৈতন্য দেহটাকে লাথি মেরে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে অসিতের। ঘৃণায় যার দিকে ফিরেও না তাকাবার কথা, তারই পদসেবা করতে হচ্ছে। আশ্চর্য ! রাগ হয়, কিন্তু ঠিক কেন হয় বোঝা যায় না। সোনালী আলোয় বিরক্তি। আলোয়ান গা থেকে খ'সে পড়ে ব'লে বিরক্তি। রাস্তায় লোকের উচ্চকণ্ঠের আলাপে বিরক্তি। অসিত আত্মবিশ্লেষণে এর কোন কারণ খুঁজে পায় না। আরও বেশী ক'রে বিরক্ত হয়।

রমা ফিরে এলো। সংগে নারায়ণ সামন্ত। জ্ঞান ফেরেনি ? কাকাবাবু আপনি একবার ডাক্তারের কাছে যাবেন ?

—আমি যাচ্ছি। অসিত উঠলো। কোন কথার অপেক্ষা না ক'রে ডাক্তার ডাকতে ছুটলো।

ডাক্তার এসে পরীক্ষা করলেন। একটা ইনজেকশন দিলেন। বললেন, ভয়ের কিছু নেই। অনেক কড়া ওষুধ খেয়েছে এতদিন—তারই রি-অ্যাকশন।

কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরলো। মাথায় জল-হাওয়া আর পা টেপার পরামর্শ দিয়ে ডাক্তার গেলেন। সারাদিনই সেবা চললো। অসিত ভাবলো : আজ রমা যেন একটু বেশী সেবায় মগ্ন।

হঠাৎ চারুদা এসে ঢুকলো। হাতে একটা ভাঁজ-করা কাগজ। সবাইকে ব্যস্ত দেখে অপ্রস্তুত হ'য়ে হাসি হাসি মুখে অনেকক্ষণ রইলো। কুশল জিজ্ঞাসা করলো। অসিত অনেকদিন যায়না বলে অনুযোগ করলো। এবং কারোর কাছ থেকে ভাল মত উত্তর না পেয়ে উঠলো।

যাবার আগে বললো, সীতার কোন খোঁজ জানিস ?

—কেন, কী হয়েছে ?

—কাল সকাল থেকে কোথায় যে গেছে, কিছু বলেও যায়নি। ভাবলুম, পুলিশের ভয়ে আবার অন্য কোথাও লুকিয়ে রাখলি কিনা—একবার জেনে আসি।

—নিজের পথ নিজে দেখে নিয়েছে, তোমার ভাবনার কি আছে ?

অসিতের কথায় চারুদা বেকুবের মত হাসলো।

—সে তো বটেই। আমার আর কি। সে ভাল থাকলেই ভাল। চলি।

চারুদা চলে গেলে রমা বললো, ভদ্রমহিলার কি হলো একবার খোঁজ নেবে না ?

—হ্যাঁ, আমি এখন খুঁজে বেড়াই আর কি।

বিকেলের মধ্যেই ডাক্তার অনেকটা সুস্থ হ'য়ে উঠলেন। বরং আরো ভাল আগের থেকে। দুপুরে নারায়ণ বাবুর সংগে অনেকক্ষণ কথা বললেন। অসিতকে চিনতে পারলেন। নিজে থেকে সন্ধ্যায় চা চাইলেন।

রমা মুখ কঠিন করে রইলো। দু তিনবার অসিতকে বললো, তোমার সংগে কথা আছে। কোন বারই বলার সুযোগ পেল না।

রাত্রে খাবার পর ডাক্তার খাটে বসেছিলেন। অসিত মোড়ায়। রমা ঢুকলো। তিনজন অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইলো। নিস্তব্ধতা ভাঙলো রমা। ডাক্তারকে বললো, তুমি অনেক সুস্থ হয়েছো এখন। দুতিন দিনের মধ্যে একেবারে ভাল হ'য়ে যাবে। ডাক্তার নিরুত্তর।

—কোথায় যাবে ঠিক ক'রে নিও। অসিত বইয়ের থেকে মুখ তুললো।

—কেসের তারিখ আগামী বুধবার।

—আজ বৃহস্পতি, রমা স্থির স্বরে বললো, রোববার উকিলের সংগে দেখা করবে। বুঝেছো ?

ডাক্তার নির্বাক।

—যখন অসুস্থ ছিলে তখন এক কথা। ভাল হবার পরে থাকার তো কোন মানে হয় না। তোমার বাড়ীর কিছু কিছু জিনিষ বিক্রি হয়েছে—বাকী সবকিছু ঠিক আছে। দরোয়ান আছে এখনও। মাইনে চাইছিল। তোমার বাড়ীওলাও কাকাবাবুর কাছে এসেছিলেন। এক মাসের ভাড়া নাকি বাকী আছে।

অসিত এত কথা জানতো না। অবাক হয়ে রমাকে দেখলো।

—তোমার জিনিষপত্রের হিসেব দেখবে ?

ডাক্তার মাথা নাড়লো।

—এখন না দেখো, পরে বুঝে নিও। রমা বাইরে যাবার আগে বললো, পরশু সকালের মধ্যে চ'লে যেও। এখানে অসুবিধা হবে।

এত শান্তভাবে এত নিষ্ঠুর কথা বলা যায়, অসিত জানতো না। ডাক্তার স্তব্ধ হয়ে বসেই রইলেন অনেক রাত অবধি। অসিতও। যাবার আগে বললো, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গেলাম। ভেতর থেকে বন্ধ করে দেবেন।

অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমলো অসিত, রমা, আর ছেলেটা। ঘুম যখন ভাঙলো তখন সূর্য অনেকটা উঠে এসেছে। দুধ আনবার জন্য অসিত তাড়াতাড়ি বার হলো। আজ অনেকটা হালকা লাগছে। রোদ-টাও মিষ্টি। তাই ফিরে ঘরে নারায়ণ সামন্তকে দেখে মনটা বিরূপ হয়ে উঠলো না তত।

চায়ে চুমুক দিয়ে নারায়ণ বাবু বললেন, একটা কথা পরিস্কার করবার জন্য এসেছি। কিছু মনে করো না তোমরা।

ভূমিকাহীন কথা ইনি বলেন না। অসিত বুঝলো, বিষয়টা গুরুতর। সামন্ত বললেন, তোমাদের উঠতে বলেছিলাম, তার কি করলে জানি না।

যদিও তোমাদের কাছে এই মাস ছাড়া আমা'র আব কিছু পাওনা নেই—তবু তোমাদের বলছি, যদি উঠে যাও তো খুব উপকা'ব হয় আমাব।

—উঠতে আপত্তি নেই আমাদের, অসিত একটু সময় নিয়ে বললো, কিন্তু আটকাচ্ছে টাকায়। আপনা'র এমাসের ভাড়া, যেখানে যাবো সেখানে তুমাসেব লাগবে। অত টাকা কোথায় পাই বলুন ?

—সেটা কি আমাব জানবাব কথা ?

বাড়ীওয়ালা স্থলভ কথা নারায়ণ সামন্ত বোধ হয় এই প্রথম বললেন। কিন্তু নেহাৎ বেখাপ্পা লাগলো না তো। বেশ মানিয়ে গেল কথাগুলো। রমা বললো, মাস শেষ হতে তো এখনও চারদিন দেরী আছে ; এর মধ্যে আপনার কি খুব অসুবিধা হবে আমরা থাকলে ?

—না, চার পাঁচ দিনের কথা নয়। উঠবেই—এটা জানতে পারলে সুবিধা হয়।

—বেশ। তবে জেনে রাখুন, রমা জোর দিয়ে বললো, সময়মত আপনি বাড়ী খালি পাবেন।

—ঠিক আছে। তাহ'লে তাই কথা রইল। এ রকম কথার পর সাধারণত উঠতে হয়। নারায়ণবাবু উঠলেন না। বললেন, তোমরা ভাবছো কাকাবাবু এমন করে বলছে কেন। বলি কি আর সাধে ? কথাটা কানাঘুষোয় শুনেছিলাম, কিছু দিন আগেই। বিশ্বাস করিনি। তাই কি হয় ? স্বামী-স্ত্রী না হ'লে কেউ এতদিন স্বামী-স্ত্রীর মত থাকতে পারে ? পাগল অবস্থাতে ডাক্তারও চেঁচিয়ে বলতো শুনেছি। ভেবেছি পাগলের প্রলাপ। কাল ডাক্তারের সংগে কথা বলে পরিষ্কার হ'লো।

নারায়ণবাবু একটু চুপ করলেন। রমা অসিত স্তব্ধ।

—দেখ, আমি ছাপোষা গেরস্থ। ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকি—যদি একথা জানাজানি হয়ে যায়, তবে আমার পাড়ায় টেঁকা যে অসম্ভব হ'য়ে উঠবে বৌমা, তোমাকেও বলি—তুমি ভাল মেয়ে ব'লেই জানতুম। ডাক্তারের মত দেবতুল্য স্বামীকে ছেড়ে তুমি আছ কি ক'রে ? হিন্দু মেয়েছেলের একজন স্বামীই থাকে—দ্রৌপদী হবার যুগ কি আর আছে ?

অসিত দেখলো, এবং ভয় পেলো, রমার চোখ লাল হ'য়ে উঠেছে।

অত্যন্ত শান্তস্বরে সে বললো,—আপনি যাকে আমার স্বামী বলে জেনেছেন, সে-ই আমার স্বামী।

—কি জানি বাবা। ছুরকম শুনি—ভয় করে।

—আপনি কি আমার, অসিত তিক্ত হেসে উঠলো, স্বামীত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হ'তে চান? ডকুমেণ্ট আছে।

—দেখিয়ে কি হবে। রমা বললো, তুমি ব'সো। কাকাবাবু, আপনি সোমবারদিন বাড়ী খালি পাবেন।

হঠাৎ চারুদা এসে ঢুকলো। উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা। হাতে কাগজ। বেশ অবিন্যস্ত।

—চৌধুরীবাবু, উত্তেজিত হয়ে কি বলতে গিয়ে নারায়ণ বাবুকে দেখে চারুদা চুপ করে গেল।

—তা হলে সে কথাই রইল। নারায়ণবাবু উঠলেন, তোমাদের অপবাদ দেবার জন্যে আসি নি। আমার অবস্থা বুঝতে পারছো তো? ডাক্তার কি ঘুমুচ্ছে?

—বোধহয়। রমা চারুদাকে বললো, বসুন চারুদা। এত সকালে?

নারায়ণবাবু বেরিয়ে গেলে চারুদা অসিতকে হাতের কাগজখানা এগিয়ে দিল। বসলো না।

—দাগ দেওয়া জায়গাটুকু পড়। কালই দেখাবো ব'লে এনেছিলাম, ব্যস্ত ছিলি ব'লে কিছু বলিনি।

অসিত অবাক হ'য়ে বাংলা দৈনিকটা দেখলো। এক জায়গায়, ছোট একটা অংশ কালির রেখায় ঘেরা। লেখা রয়েছে—

গতকল্য দ্বিপ্রহরে মানকুণ্ডু ষ্টেশনের নিকটে এক অজ্ঞাত পরিচয় তরুণী (২২) ট্রেনে কাটা পড়িয়া মারা গিয়াছে। শবব্যবচ্ছেদের পর জানা যায় যে তরুণী অন্তঃসত্ত্বা ছিল। পুলিশ ইহাকে আত্মহত্যার ঘটনা বলিয়া সন্দেহ করিতেছে।

অনেকবার অসিত পড়লো। মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলো না।

—পড়লাম তো, তাতে কি?

—কাল বললাম না, সীতাকে পাওয়া যাচ্ছে না?

—সীতা ? দূর, অন্তঃসত্ত্বা লেখা রয়েছে।

—খারাপ মেয়েছেলে ছিল, তুই জানিস না। আমার আগাগোড়াই সন্দেহ ছিল। পরশু থেকে পাচ্ছি না—কাল সকালে এই খবর দেখে মনে খটকা লাগলো। তবু ভাবলুম ভুল হ'তেও পারে। মেয়েটার জন্যে মন খারাপ হয়েই ছিল—সন্ধ্যেবেলা বাড়ী গেলুম। গিয়ে একটা আমার নামে চিঠি পেলুম। আর সন্দেহ রইল না।

—কি চিঠি, দেখি।

চারুদা পকেট থেকে একটা খাম বের করলো—চারুদার নাম-ঠিকানা লেখা। ভেতরে একটা চিঠি—কাগজটা দেখে অসিত চিনলো। প্যাডটা অসিতই সীতাকে দিয়েছিল। লেখা—

মেজদা,

কেন যে বেঁচে থাকবো, কেন যে তোমাকে জ্বালাবো—এতদিন এর কোন কারণই খুঁজে পেলাম না। বিশ্বাস করো, আমি থাকার খুব চেষ্টা করেছি। হয়তো সে চেষ্টায় আন্তরিকতার অভাব ছিল—আমি জানি না। যেখানে থাকা না থাকা সমান—সেখানে আমি না-থাকাটাই বেছে নিলাম। আমাকে খুঁজে সময় নষ্ট করো না।

আমার আত্মীয় বলে কেউ ছিল না। তুমিই আত্মীয়তার, স্নেহের, ঘরের স্বাদ বুঝতে দিয়েছিলে। কিন্তু আমার শিরায় শিরায় অর্থহীনতা—তুমি কি করবে ? অযথা একটা বাজে মেয়ের জন্য দুঃখ ক'রো না। ভেবো, পাপ বিদেয় হয়েছে, ভালই হলো। সান্ত্বনা পাবে।

আরেকটা কথা। ছেলেটাকে মাসীর কাছ থেকে নিয়ে এসো। আর একটা ঝি রেখো রান্নার জন্য।

প্রণাম নিও। ইতি—

সীতা

খামে হাওড়া ষ্টেশনের ছাপ—তারিখ পরশু দুপুরের। অসিত বললো, গিয়েছে, ভালই হয়েছে। তোমার অত ভাবনার কি ?

—না, ভাবছি না তো। চারুদা চটপট উত্তর দিল, তোর কাছে লুকিয়েছে, আমাকে মিথ্যে কথা বলেছে—কী পাজী মেয়ে দেখেছিস ?

রমা এতক্ষণ চুপ করে কথা শুনছিল। বললো, কি হয়েছে ?

—ঐ একটা বাজে মেয়ে, অসিত মুখ বেঁকিয়ে উত্তর দিল, আত্মহত্যা করেছে।

—আত্মহত্যা ? কই, দেখি চিঠিটা।

—দেখে কি করবে ? অসিত চিঠিটা কুচিকুচি ক'রে বললো, ন্যাকামীতে ভর্তি।

—আহা, চিঠিটা ছিঁড়ে ফেললি ? পুলিশকে দিলে ওরা নাম-ধাম জানতে পারতো।

—থাক না, অজ্ঞাতই থাক।

তিনজনে চুপ। অসিতের অস্বস্তি লাগে। রমাকে বললো,

—চারুদাকে একটু চা ক'রে দাও।

—না, না। আমি এক্ষুনি উঠবো—দোকান খোলা। তোকে খবরটা দিতে এসেছিলাম শুধু। এমন মেয়ে দলে নিস কেন ? চারুদা উঠে অস্বাভাবিক জোর দিয়ে বললো, ভয়ানক পাজী মেয়ে।

—কি করে চিনবো বলো ? অসিত বললো, কাউকে কি চেনা যায় ?

—পাজী, বদ, খারাপ মেয়ে—তবু থাকলো না। চারুদা আশ্চর্যভাবে হাসলো, মেজদা ডাকতো কিনা। তবে এ আর কদিন ? দুদিনেই দুঃখ টুঃখ সব কেটে যাবে।

চারুদার কি চোখে জল ? গলার স্বর কি বিকৃত ? অসিত খুঁজলো, পেল না। হাসলো।

—হ্যাঁ। কে কার জন্যে ব'সে থাকে বলো ?

—আজ চলি। চারুদা রমাকে বললো, তোমার রোগীর খবর কি ? ঘুমোচ্ছে ?

—কি জানি, সাড়াশব্দ তো কিছু শুনছি না। ওঠেনি বোধহয় এখনও।

—সে কি। সাড়ে ন'টা বাজলো—এখনও ঘুম ?

চারুদা চলে গেল। রমা অসিতকে বললো, সত্যি, এতক্ষণ কি ঘুমোচ্ছে। দেখো তো একবার ওঘরে। মরে টরে গেল নাকি ?

—দূর। ও কথা বলতে নেই। অসিত উঠলো।

ওঘরের দরজা বন্ধ। ধাক্কা দিতে খুলে গেল। সব কিছু পরিপাটি করে গোছানো। বিছানাটা টান টান করে পাতা—কোনদিন যেন কেউ শোয় নি তাতে। ডাক্তার নেই। ঘরের আনাচে কানাচে নেই, খাটের নীচে নেই, বাথরুমে নেই।

—রমা, ডাক্তার কি সকালে কোথাও বেরিয়েছে ?

—কেন ?

—ঘরে তো নেই।

—সে কি !

রমাও খুঁজলো। নারায়ণ বাবুর বাড়ীতে নেই, বাইরের রকে নেই, রাস্তার মোড়ে নেই। রমা শেষে বললো,

—যাক গে। গেছে যখন, আমাদের কি ?

—একটু খুঁজতে হবে না ? পাগল মানুষ।

—কোথায় খুঁজবে ? গেছে যাক।

—দায়িত্ব আমাদের আছে। অসিত একটু ভেবে বললো, বেলে খালাস পেয়েছে—উকিলকে ধরবে তো ?

—তা ঠিক। তুমি অন্ততঃ তাঁকে জানিয়ে এসো।

অসিত বার হলো। বার হওয়া দরকার ছিল। এই পথটা দরকার। দায়িত্ব পালন করা দরকার। সারাদিনের ক্লান্তি দরকার। অনেক কাজ করা দরকার। দরকার ? কথাটা বার বার মনে মনে আবৃত্তি করতে করতে যেন নেশার মত পেয়ে বসে। শব্দটা অদ্ভুত লাগে।

অসিত অ্যাডভোকেটকে বাড়ীতে পেলো না। কোর্টে গিয়ে তাঁকে জানালো। দুটো থানায় গেল। একটা তাদের অঞ্চলের, আরেকটা ডাক্তারের। ডাক্তারখানায় গেল। দরোয়ানকে বললো খুঁজতে। ডাক্তারের পরিচিতদের বাড়ী গেল। চলতে চলতে রাস্তায় নজর রাখলে, কোথাও পেল না। কোথাও ডাক্তার নেই। সীতা জীবন থেকে পালিয়েছে। ডাক্তার কোথায় পালালো ?

দুপুর ম্লান হ'লো। সন্ধ্যা গাঢ়তর। রাত। পার্কের ঠাণ্ডা মাটিতে জমাট কুয়াশা। তামার তারে বিদ্যুৎ ঘন হ'য়ে এলো। কালো, ময়লা

আকাশে তারারা অদৃশ্য। আশ পাশের বাড়ীর জানালায় আলো নিভলো। অনেক পাতা ঝরলো। গায়ে, বেঞ্চে, ঘাসে।

দূরের রেডিওতে শেষের ঘণ্টা বাজলো। রাস্তা ফাঁকা। অসিত অনেকবার ভাবতে চেষ্টা করলো, ভাবতে চাইলো, ভাবলো : এই বেশ।

সত্যিই এই বেশ, এই বৃত্ত। এই অপরিচয় এই অজ্ঞানতা। চারুদা সীতাকে জানলো না, ডাক্তারকে চিনলোই না। রমা পূর্ব পরিচিত সীতার পরিচয় জানলো না। ডাক্তার আত্মবিস্মৃত। জানার যন্ত্রণা আছে, না-জানাই শান্তিদায়ক। অসিত শুধু দর্শক, কাউকেই জানে না। অতএব, দুঃখ নয়—শুধু ক্লান্তি। বৃত্তের সম্পূর্ণতায় এখন ঘুম, শুধু বিশ্রাম। ঘুমোতে হবে আজ।

অসিত উঠলো।

এত রাত্রেও রমা জেগে থাকবে অসিত আশংকা করে নি। দরজা খুলে রমা বললো, এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?

—সব খোঁজ খবর করতে হোল।

—দেখ তো, খাওয়া নেই নাওয়া নেই। কি চেহারা হয়েছে। তোমার অত দায় কিসের ?

—দায় ? দায় নয়। অসিত বললো, একটা বিপদগ্রস্থ মানুষ—মাথার ঠিক নেই। একটু খোঁজ নিতে হয় না ?

—আমরা তো যথেষ্ট করেছি। আবার কি। নাও, হাত মুখ ধুয়ে খাবে এসো।

অসিত খেতে বসলো, রমা সামনে। অনেক আগে যেমন বসতো। চার ধার স্তব্ধ। রমা বললো,তুমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছ, না ?

—কিসে ? অসিত বিস্মিত হয়ে মুখ তুললো।

—এই কদিনে যা ঘটলো, তা দেখে ?

—তাই মনে হয় তোমার ?

—তাই মনে হয়। তোমার হাঁটা চলা, কথা বার্তা সব কিছুতেই মনে হয় তুমি ভীত, ক্লান্ত। কেমন যেন পালটে গেছ একেবারে।

—দিন গেলে মানুষ পালটাবে না ? বয়স হচ্ছে তো।

—বয়স হচ্ছে বলে সব সময় পালিয়ে বেড়াবে ? রাস্তায় ঘাটে

ঘুরবে ? আমাকে এড়িয়ে গেছ, বাচ্চাটাকে ভাল করে দেখই নি কোন দিন। কেন, কি হয়েছে তোমার ?

অসিত উত্তর না দিয়ে ভাত শেষ করলো। রমা আর একটু ভাত দিতে গেলে বারণ করলো, জল খেলো। রমা বললো,

—ডাক্তারের কথায় তুমি আমাকে চলে যেতে বলেছিলে কেন ? আমাকে তোমার সন্দেহ হয় ?

অসিত স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো, একটু হেসে, উঠলো। আঁচাতে আঁচাতে বললো,

—কাল থেকে বলছো, কি কথা আছে। বলবে না ?

—সেই জন্যেই তো জেগে আছি। ঘরে এসো বলছি।

চারদিক কেমন গোছানো, ফাঁকা ফাঁকা। কয়েকটা জিনিষ বাঁধা, কয়েকটা আবার উধাও। রমা কি কালই বাড়ী ছাড়বার মতলব করছে নাকি ? বাড়ী পেল কোথায় ?

ঘরে ঢুকে কোন কথা না ব'লে অসিত সোজা বিছানায় গিয়ে বসলো। রমা নিজের বিছানায় না গিয়ে, অসিতের কাছে বসলো।

—আগে তুমি কি বলতে, মনে পড়ে ? রমা বললো, বলতে জীবনের নিজস্ব কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা জানিনা, তবে তোমার আমার একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে—তা হচ্ছে, জীবনকে সহজ সুন্দর বলিষ্ঠ করা। যখন যাদবপুরে থাকতাম, সেই ষ্ট্রাইকের আগে, একদিন বলেছিলে—জীবনের ছোট দিকগুলোর ষড়যন্ত্রে মাঝে মাঝে এমন জড়িয়ে পড়ি যে তখন নিজেকেই ভয় করে বেশী। যদি কোনদিন অনেক নীচে নামার মত, ভয়ে পালিয়ে যাবার মত অঘটন ঘটার সম্ভাবনা হয়—তখন তুমি আমাকে শক্ত হাতে ফিরিয়ে দিও। আঘাত ক'রো। মনে পড়ে তোমার ?

—হঠাৎ একথা কেন ?

—কারণ আছে। রমা লেপ ভাল করে গায়ে জড়িয়ে দিল। মুখ নীচু করে কি ভাবলো। বললো, তুমি মিথ্যে কথা বলো না। শুধু আঘাতে আঘাতে স্তম্ভিত হ'য়ে গেছ। যেখান থেকে আমরা দুজনে এক সংগে চলছি সেখানে আবার যদি ফিরে যাও—নিশ্চয়ই ফের চিনতে

পারবে তুমি। জানি, ঠিক সেই দিনে সেই অবস্থায় ফিরতে পারবে না। যাওয়া যায় না—তবু আরেকবার চেষ্টা করতে দোষ কি ? তাই ভেবে দেখলাম, কিছুদিন তোমার আমার আলাদা থাকাই ভাল।

—আলাদা ?

—হ্যাঁ আলাদা। দূরে দূরে। আবার ফিরে আসবো, দুজনে এক সংগে চলবো আবার। আগের মত অপরিচয়ের দূরত্ব তো আর থাকবে না—সেতু তো রয়েই গেল, বাচ্চাটা। একটু দূর থেকে সবটা স্পষ্ট দেখা যাবে, ভাল করে বিচার করতে পারবে তাহ'লে। তুমি বাড়ীতে ফিরে যাও, মায়ের কাছে, তাদের গুছিয়ে দিয়ে নিজেকে প্রস্তুত করে যখনই ডাকবে—আসবো।

—তুমি ?

—যেদিন ডাক্তারের প্রস্তাব জানালে আমাকে সেদিনই বুঝেছিলাম, আর উপায় নেই। দূরে যেতেই হবে। তখন থেকেই খুব অ্যাপ্লিকে-শন করতাম। একটা ইন্টারভিউ দিলাম—পরশু সন্ধ্যায় তার অ্যাপয়েন্ট-মেণ্ট লেটার এসেছে। রাঁচীর কাছে একটা মিশনারী স্কুল—হস্টেল আছে মেয়েদের—শিক্ষকতার সংগে সেখানকার দায়িত্বও নিতে হবে। নার্সিং জানাটা কাজে লেগেছে।

—কবে যেতে হবে ?

—সোমবার কাজে জয়েন করতে হবে। ভাবছি, কাল যাবো।

—কালই ?

হেসে রমা কি বলতে যাচ্ছিল, বাচ্চাটা কেঁদে ওঠায় ও বিছানায় যেতে হলো। ছেলেটাকে নিয়ে এলো, লেপের তলায় নিয়ে আদর করলো। গোলাপী গাল, লাল টুকটুকে ঠোঁট, ছোট ছোট হাতদুটো—ঠিক এক রাশ শিউলি ফুল।

—মুখটা সব সময় অমন বিষণ্ণ ক'রে রেখ না তো। রমা বাচ্চাটাকে অসিতের কোলে দিল, একটু আদর করো।

কী নরম আর উষ্ণ ? শব্দ ক'রে বাচ্চাটা কি কথা বলতে চাইছে ? বাবা মা বুঝতে পারে ? কে জানে। অসিত গাল টিপলো।

—দেখ, অনেকটা তোমার মত দেখতে হয়েছে, তাই না।

—দূর। তোমার মত।

—হ্যাঁঃ আমার মত হলে অত সুন্দর হ'তো কি না। রমা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো, কী সুন্দর না?

অসিত বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, কালই যাবে?

—দেরী করে কী লাভ? তুমি বারণ কোরো না। রমা অনুনয় ক'রে বললো, তুমি অমন করলে যেতে পারবো না।

—যাবে।

—এমন ক'রে বলো না। খারাপ লাগে। তুমি একটু হাসো। কতদিন তোমাকে ভাল ক'রে হাসতে দেখি না।

রমার পাগলামিতে অসিত সত্যিই হাসলো। বললো, ওখানে বাচ্চাটার অসুবিধা হবে না তো?

—অসুবিধা হবে কেন? স্বাস্থ্যকর জায়গা, ভাল খাওয়া জুটবে—দেখ, পরে যখন যাবে ওখানে, আমি আরেকটা ইয়া ধুমসো হ'য়ে গেছি।

—সেই ভাল। অসিত বাচ্চাটাকে তুলে মুখের কাছে নিয়ে এলো, ভেংচি কাটলো, হাসলো। রমার দিকে তাকিয়ে বললো, পরিবর্তন একটা দরকার, তাই না?

—নিশ্চয়ই। রমা, আগের মত জোর দিয়ে, বললো—দুঃখ যন্ত্রণা আছেই, তাই বলে তা' থেকে উঠতে হবে না! উঠতে গেলে যদি একটু দুঃখই পেতে হয়—স্বীকার ক'রে নাও। বাঁচতে তো হবেই।

বাচ্চাটার বোধ হয় আর বাবার আদর ভাল লাগলো না। কাঁদলো। রমা ওকে নিয়ে নিজের বিছানায় গেল। বললো,

—এছাড়া আর অন্য কোন উপায় নেই বুঝলে? এই অবস্থাকে সাময়িক মনে ক'রে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হওয়াই ভাল নয়? আর জেগোনা, অনেক রাত হয়েছে।

—হ্যাঁ শুয়ে পড়'ই ভাল।

অসিত উঠে আলো নিভিয়ে দিল।

হাওড়া ষ্টেশন। ট্রেণ ফেল করার আশংকা। গুঁতোগুতি-ঠেলাঠেলি, মাইকে দুর্বোধ্য ঘোষণা। চীৎকার, কুলি সামলানো, বিদায় দেওয়া, অভ্যর্থনা করা, চুরি-জোচ্চুরি—সব কিছু মিলে এতই বড়, এতই তীব্র ব্যাপার, নিজের সত্তা মোটে অনুভব করা যায় না। সবাই চলছে। কেউ আসছে, কেউ যাচ্ছে। দাঁড়াবার উপায় নেই। তা'হলেই পিষে যেতে হবে। যে কোন একটা স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলেই, ব্যস্, নিশ্চিন্দি। নিজের আর চলতে হয় না—স্রোতই ঠেলে নিয়ে চলে। রমার কথাই ঠিক, স্রোতকে, স্রোতের যন্ত্রণাকে স্বীকার

করেই এর উপরে উঠতে হয়। বাঁচতে তো হবেই। অসিত সান্ত্বনা খোঁজে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা বোঝাই। রমার ভাগ্য ভাল। জানালার কাছে বসবার জায়গা পেয়েছে। দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়তে অসিত নামলো। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বললো,

—পরে জানালা বন্ধ করে দিও। নইলে ঠাণ্ডা লাগবে।

—দেবো। আর তুমি এখান থেকে ফেরার পথে মায়ের কাছে যাবে। সব বলবে। আজ সন্ধ্যায়, কিংবা কাল রোববার আছে, কালকে জিনিষপত্র সব নিয়ে যাবে। কেমন ?

—যাবো।

—টাকাগুলো ভাল ক'রে রেখেছ তো ?

অসিত মাথা নাড়লো। ট্রেণ ছাড়বার ঠিক আগের মুহূর্তে এমন শব্দ হয়, মনে হয়, এই বিরাট দানবের মত ষ্টেশনটাই যেন হাহাকার করে ওঠে। রমা বাচ্চাটাকে জানালার কাছে তুললো।

—দেখ, কেমন হাসছে।

অসিত হাসলো। রমা হাসলো।

—বড়দিন তো কাছেই, আসবে সে সময় ?

ট্রেণ ছাড়লো। অসিত সংগে সংগে এগোল।

—যাবো। পৌঁছেই চিঠি দিও।

—পৌঁছেই দেবো। তুমি আর এসো না। ধাক্কা লাগবে। আমাকে ডেকে নিতে ভুলো না যেন—এ রকম ছেড়ে থাকতে পারবো না কিন্তু।

রমা হাসলো। অসিত হাসলো। রমার চোখে জল। অসিত দাঁড়িয়ে দেখলো, ট্রেণটা অনেক দূরে চলে গেল। মিলিয়ে গেল।

কেমন নাটকের মত, জীবন নয়। স্তব্ধ অসিত ফিরলো। মায়ের কাছে যেতে হবে। যেখান থেকে সুরু, সেখানে। রমাকে ডাকতে হবে। এমন ছেড়ে থাকা যায় না।

রমা আর—, ভাবতে গিয়ে মনে পড়লো, আজও বাচ্চাটার কোন নাম দেওয়া হয়নি। কিন্তু চিরকাল কি ছেলেটা এমনি অচিহ্নিতই থেকে যাবে নাকি ? দূর, তাই কি হয় ? নিশ্চয়ই নতুন নাম দিতে হবে তাকে। নামের সংগে নতুন ইতিহাস। নতুন নাম, নতুন ইতিহাসে সেও সম্পূর্ণ দ্বীপ হয়ে উঠবে একদিন।

অন্য আর এক বেদনার দ্বীপ।